হিমালয়ের হৃদয় হতে

সুনীল চৌধুরী

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭৩

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ২৯

প্রথম প্রকাশ ১৩৬৭

মুদ্রাকর
চন্দ্রশেখর চৌধুরী
লক্ষ্মী প্রেস
১২ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

শ্রীহেমচন্দ্র দেব

শ্রদ্ধাস্পদেষু

॥ এক ॥

রুদ্রপ্রয়াগে সেবার দারুণ ভীড়।

রুদ্রপ্রয়াগে বদরীনারায়ণ থেকে আসা অলকানন্দা নদীর সঙ্গে কেদারনাথ থেকে আসা মন্দাকিনী নদীর সঙ্গম হয়েছে। এ-কারণে কোনো স্নানযোগ থাকলে এ-অঞ্চলের মানুষ জমায়েত হয় রুদ্রপ্রয়াগে। জনপদটি গড়ে উঠেছে অলকানন্দার তু'পারে। মাঝে আছে একটা লোহার পুল, নদী পারাপার করার।

প্রয়াগের তু'পারের পথঘাট দোকানঘর ধর্মশালায় থই থই মানুষের ভীড় আর গাদাগাদি।

বেশি ভীড় বাস-স্ট্যাণ্ডের আশপাশের ধর্মশালাগুলোয়। সবাই চায় ভোরের বাস ধরতে। বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছাকাছি থাকার জায়গা পেলে বাসের টিকিটের জন্য লাইন দেবার সুবিধে হয়।

কি একটা মেলা আর স্নানযোগ ছিল সেবার। সাধারণ কেদার-বদরী তীর্থযাত্রী ছাড়াও বহু স্থানীয় মানুষের সমাগম হয়েছিল রুদ্রপ্রয়াগে। আর এ-কারণেই অত ভীড়। অসংখ্য মানুষ রাত্রের আশ্রয়ের সন্ধানে হন্যে হয়ে একবার অলকানন্দা নদীর এ-পার একবার ও-পারে মালপত্র লটবহর নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে।

এখনকার মতো আগের দিনে এত বাস চলত না কেদার-বদরী, গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর পথে। অবশ্য যাত্রীর সংখ্যাও এত ছিল না সেকালে। যেদিনের কথা বলছি তা আজ থেকে প্রায় পনেরো-ষোল বছর আগের।

একা হিমালয়ে ঘুরতাম। সেবারও একা আমি। বার কয়েক ও-পথে যাওয়া-আসা করার ফলে যাত্রাপথের চটিওয়ালা দোকানদার,

ধাওা এবং মালবাহকের সঙ্গে বন্ধুত্ব আর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। এ-কারণে মাথা গোঁজার আশ্রয়ের অভাব হয়নি কখনো।

ভীড়ের মধ্যে এসেও যথারীতি এখানে একটা ঘর পেয়েছি বাস-স্ট্যাণ্ড সংলগ্ন কালীকম্বলী ধর্মশালার দোতলায়।

ধর্মশালার একতলা ও দোতলায় পাশাপাশি কয়েকটা ঘরের সামনে টানা বারান্দা। ঘরের অভাবে অনেক পরিবার বারান্দায় বিছানা পেতেছে। রুদ্রপ্রয়াগের উচ্চতা মাত্র আড়াই হাজার ফুট। মে-জুন মাসে বেশ গরম। ঘরের চেয়ে বারান্দায় আরাম বেশি। অবশ্য মেয়েদের পক্ষে বারান্দা সুখকর নয়। যদিও রাজস্থান আর উত্তরপ্রদেশের দেহাতি মেয়েরা বারান্দায় খুশি মনে একরাতের সংসার পেতেছে দেখছি।

আমি একাকী মানুষ। ঘর না পেলেও আমার কিছু যায় আসে না।

একটা কাঁধ-ঝোলা, দুটি পাতলা কম্বল, আর একটি লাঠি আমার সঙ্গী। এ-নিয়েই হিমালয় ভ্রমণ করি।

ঘরের এক কোণে বিছানা পেতে দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে এলাম ধর্মশালা থেকে। পথের প্রয়োজনীয় কিছু টুকিটাকি মালপত্র কেনা দরকার। তাছাড়া রাত্রের আহার আগে-ভাগে সেরে না নিলে কপালে কিছুই জুটবে না হয়ত।

কাল ভোরেই বাস ছাড়বে কেদারনাথের পথে। টিকিটের বন্দোবস্ত ধর্মশালার চৌকিদার করে দিয়েছে। টিকিট এখনো হাতে পাইনি। পাব কাল ভোরে। আর তখন মালপত্র নিয়ে বাসে উঠলেই হল, এককথায় পূর্ব পরিচয় থাকায় অন্য যাত্রীর চেয়ে আমার যাত্রা নিঃশঙ্ক।

সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নেমে এলাম। সিঁড়ির পাশেই চৌকিদারের ঘর। ঘরের সামনে একগাদা যাত্রীর ভীড়। সবাই ঘর চায়। একটি মাত্র রাত্রের আশ্রয়ের জন্য মোটা টাকা কবুল

করতে পেছপা নয় কেউ। বিদেশ-বিভুঁয়ে খোলা আকাশের নিচে কে-ই বা রাত কাটাতে চায়! ঘর নেই, বারান্দায় থাকার জন্য অন্তত একটু জায়গা দাও। তাও নেই। ঘর বারান্দা সর্বত্র থিক থিক করছে মানুষ।

যাত্রীদের অনুরোধের ঠেলায় চৌকিদারের অবস্থা কাহিল। হাতজোড় করে জানাচ্ছে, ঘর নেই। বারান্দায় পা রাখার জায়গা নেই। অন্য ধর্মশালায় যাও।

কোথায় যাবে? সর্বত্র ঘুরেই তারা কালীকম্বলীবাবার ধর্মশালায় এসেছে। এখানে জায়গা না পেলে পথে খোলা আকাশের নিচেই রাত কাটাতে হবে।

আবছা আলো-অন্ধকারে নজরে পড়ল চৌকিদারের পায়া নড়বড়ে দড়ির খাটিয়ার ওপর ঋষিকেশের পরিচিতা প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা আর তার অনূঢ়া-কন্যা শমী বসে আছে। ওরাও তাহলে জায়গা পায় নি! না পাওয়াই স্বাভাবিক। বাস থামতেই প্রায় দৌড়ঝাঁপ করে এখানে চলে এসেছিলাম বলে তবু থাকার জায়গা পেয়েছি। রুদ্রপ্রয়াগ ওদের অপরিচিত জায়গা। এ-কারণেই ঘর যোগাড় করতে পারে নি।

ঋষিকেশে ওদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বাস-স্ট্যাণ্ডে। ঘরের খোঁজে ভাঙা হিন্দীতে স্থানীয় একজন দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করছিল। বাঙালী দেখে যেচে আলাপ করে ঘরের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম গোলাবকোঠী ধর্মশালায়।

সেই সূত্রে যখনি দেখা হয়েছে পরে দু'চারটে কথা হয়েছে মা-মেয়ের সঙ্গে। কথা ঘরোয়া। কোথা থেকে এসেছি। কে আছে ঘরে। বিয়ে করেছি কি-না, ইত্যাদি।

লক্ষ্য করেছি, আমার সঙ্গে আলাপ করার তেমন পক্ষপাতী নন প্রৌঢ়া মহিলা। অবশ্য মেয়ে অর্থাৎ শমী খুবই আলাপী। দেখা হয়েছে যখনই তখনি মিষ্টি হেসে প্রশ্ন করেছে, কোথায় চললেন?

আমিও হেসে জবাব দিয়েছি আমার গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে।

শমী জিজ্ঞাসা করেছে, আচ্ছা ঋষিকেশে লছমনঝুলা আর গীতা-ভবন ছাড়া আর কিছু দেখার নেই নাকি?

কেন ভরতজীর মন্দির, লক্ষ্মণ মন্দির আর চন্দ্রেশ্বর শিবের মন্দির দেখেন নি?

লক্ষ্মণ মন্দির ত্রিবেণীর ঘাটের কাছে না?

হ্যাঁ।

ওটা দেখেছি। কিন্তু ভরত মন্দির বা চন্দ্রেশ্বর শিবের মন্দির তো দেখিনি? কোথায় ওগুলো?

কাছেই, দেখে আসুন না।

আপনি যাবেন না? শমীর চোখ দুটোয় যেন প্রার্থনার আভাস।

আমার একটু কাজ আছে।

মন্দির দেখে না হয় কাজটা সারলেন। কিছুই চিনি না আমরা, কোথায় ঘুরব?

কোনো জবাব দিলাম না। আমাকে মৌন দেখে শমী মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, চলনা মা, মন্দির দুটো দেখে আসি।

মহিলা যেন তেমন খুশি হলেন না বলে মনে হল আমার। মেয়ের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, এখন মন্দির দেখতে বেরোলে আমার সন্ধ্যা-আহ্নিক আর হবে না।

উনি তো বলছেন কাছেই। আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল শমী, তাই না?

দুটো মন্দির দেখতে বড়জোর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগবে। ভরত মন্দির সামনেই তবে চন্দ্রেশ্বর শিব কিছুটা দূরে।

শমী আবদারের সুরে বলল, চল না মা, দেখে আসি।

আজ না হয় থাক। পরে একদিন দেখে নেবেন। স্থানীয় যে কাউকে জিজ্ঞাসা করলে মন্দিরের রাস্তা দেখিয়ে দেবে। মহিলার ভাব-গতিক দেখে বললাম।

আমার কথায় মহিলা খুশি হয়ে বললেন, সেই ভাল। রামচন্দ্র মন্দিরের আরতি দেখব বলে বেরিয়েছি আজ।

মায়ের কথায় শমী বলল, কাল ভোরের বাসে কেদার-বদরী চলে যাব। আজ না দেখলে আর দেখা হবে না পরে।

মহিলা বেশ কঠিন গলায় বললেন, মন্দির তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। ফেরার সময় দেখলেও চলবে।

শমী চটে গিয়ে বলে—আরতিও পালাচ্ছে না। পরে একদিন দেখলে চলত।

শমী!···প্রৌঢ়া কঠিন গলায় ধমকে উঠলেন।

বেড়াতে বেরিয়ে মা-মেয়ের ঝগড়া দেখার আগ্রহ আমার নেই। বললাম, কোনটাই পালাচ্ছে না। মায়ের যখন ইচ্ছে তখন আজ নাই বা গেলেন। তা ছাড়া আমার কিছু কেনাকাটা বাকি আছে। আমি চলি।

মা-মেয়েকে পথে ছেড়ে সেদিন দ্রুতপায়ে বাজারের দিকে পালিয়েছিলাম।

আজও সেই মা-মেয়েকে ঘরের জন্যে চৌকিদারের দ্বারস্থ হতে দেখে পলায়নী মনোবৃত্তি পেয়ে বসল আমায়। কর্তব্য-জ্ঞানশূন্য হয়ে দ্রুতপায়ে সদর দরজার দিকে সরে পড়লাম। ঋষিকেশে ওদের জন্য ঘর যোগাড় করে দিয়েছি। সে কাজ সহজ ছিল ওখানে। কিন্তু এই রুদ্রপ্রয়াগে ঘর যোগাড় করা আর বাঘের দুধ যোগাড় করা একই ব্যাপার। উল্টে নিজেই আবার আশ্রয়চ্যুত না হই।

এর ওপর আর একটা আশংকা, আমার গায়ে-পড়ে সাহায্য করাটা প্রৌঢ়া মহিলা খুশি মনে নেবেন না হয়তো।

ধর্মশালার সদর দরজা পেরিয়ে রাস্তায় নেমে লম্বা লম্বা পা ফেলতেই পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনলাম, শুনছেন?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও থামতে হল। চেষ্টা করলে পালাতে পারতাম না

তা নয়, তবু থামলাম। ভাবলাম, সন্ধান যখন পেয়েছে তখন কমলী আমায় ছাড়বে না। এ-মুহূর্তে গা ঢাকা দিলেও ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করবে। ধর্মশালায় ফিরলেই ধরবে। তাছাড়া ডাকটা যখন প্রৌঢ়ার নয়, তখন না দাঁড়াবার কারণও নেই।

ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম শমী আমার সামনে দাঁড়িয়ে। অবাক হবার ভান করে বললাম, আপনি!

এই আমাদের বাস এসে পৌঁছল।

তাই নাকি, তা এত দেরি হল কেন? সব বাস তো একসঙ্গেই ছেড়েছিল।

আর বলবেন না। পথে কয়েকবারই বাস খারাপ হয়ে গেছল।

কোথায় উঠেছেন?

কোথাও ঘর পাচ্ছি না। আপনি কোথায় উঠেছেন?

লুকিয়ে লাভ হবে না। বললাম।

আমাদের একটু থাকার ব্যবস্থা করে দিন। চৌকিদার বলছে, একটাও ঘর নেই।

অন্য ধর্মশালা দেখেছেন?

সব দেখেই তবে এখানে এসেছি।

শমীর মা ইতিমধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন সামনে। খুবই ঘনিষ্ঠতার সুরে বললেন, তুমি তো একটা ঘর পেয়েছ শুনলাম। আমাদের একটা ঘর ব্যবস্থা করে দাও না বাবা।

মহিলার কথায় খুবই বিব্রত বোধ করে বললাম, এখানে আর ঘর নেই। বরং অন্য ধর্মশালায় চলুন, চেষ্টা করে দেখি।

কোথাও এতটুকু ঠাঁই নেই। সব খুঁজে দেখে এসেছি। এখন এই মেয়ে নিয়ে কোথায় রাত কাটাই?

মহিলা খুবই চিন্তিত। শমীকেও বেশ চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে। মহিলা একবার মেয়ের মুখ আর একবার আমার মুখে চোখ বুলিয়ে বললেন, একটা কথা বলি বাবা। তুমি তো আমার ছেলের মতন।

তোমার ঘরেই আমাদের থাকার ব্যবস্থাটা করে দাও আজ রাতের মতো।

মহিলার প্রস্তাবে কুণ্ঠিত গলায় বললাম, সেটা কি ভাল দেখাবে ?

কিসের খারাপ বাবা ? তুমি আমার ছেলের মতন। ছেলের সঙ্গে মা থাকবে এতে আর ভাল খারাপ দেখার কি আছে ? তাছাড়া বিদেশে অত ভাবলে চলে ?

আমি শমীর দিকে তাকিয়ে অনুভব করতে চাইলাম ওর কি মত। চোখাচোখি হতেই শমীর কান লাল। মুখ নামিয়ে নিয়ে মায়ের উদ্দেশ্যে বলল, অন্য কোথাও চল মা। ওঁর হয়তো অসুবিধে হবে।

মহিলা ধমক দিয়ে মেয়েকে থামিয়ে বললেন, কিচ্ছু অসুবিধে হবে না। একটা তো রাত, ঘরের এক কোণে কাটিয়ে দেব। তাছাড়া ও তো ছেলের মতন, ওকে আবার লজ্জা কিসের! বাইরে বেরিয়ে অত-শত ভাবলে চলে না, বুঝলি ?

অগত্যা ঘরের দরজা খুলে দিলাম।

শমী বিছানাপত্র ঘরে তুলে আমায় জিজ্ঞাসা করল, কোথায় বেরোচ্ছেন এখন ?

বাজারের দিকে যাব একবার, কিছু কেনাকাটা বাকি আছে।

বাসের টিকিট পাওয়া যাবে ?

নিচেই বাস-স্ট্যাণ্ড, ওখানে পাবেন।

আপনার টিকিট কাটা হয়ে গেছে ?

হ্যাঁ, একটা টিকিট ব্যবস্থা করেছি।

আমাদের টিকিটের কি হবে বলুন তো ? কিছুই জানি না এসবের।

শমীর মা পুঁটুলি খুলতে খুলতে বললেন, বাবা, দুটো টিকিটের ব্যবস্থা করে দাও। আমরা মেয়েমানুষ, এরা কথা বোঝে না, পাত্তা দেয় না। কালকের টিকিট না পেলে অযথা বসে থাকতে হবে।

চিন্তায় পড়লাম। এত যাত্রীর ভীড়ে কি এখন কালকের বাসের টিকিট পাওয়া যাবে।

আমায় ভাবতে দেখে মহিলা অনুরোধের সুরে বললেন, বাবা, তুমি একটু চেষ্টা করলেই পারবে যোগাড় করতে। সবই দেখছি তোমার চেনা-জানা।

রাজী হলাম। ঘরের চাবি মহিলার হাতে দিয়ে বেরোচ্ছি এমন সময় শমী ওর মাকে বলল, আমি বাস-স্ট্যাণ্ডটা দেখে আসি মা।

মহিলা কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন মেয়ের দিকে। ঋষিকেশে যেমন ভাবে ভরত মন্দির দেখার প্রস্তাবে তাকিয়েছিলেন, ঠিক তেমন মনে হল আমার।

শমী বলল, বাস-স্ট্যাণ্ড তো নিচেই। দেখেই চলে আসব। কাল ভোরে খুঁজতে লাগবে না।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুমতি দিলেন কন্যাকে। বললেন, অন্ধকার হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি ফিরবি।

আমি যাব আর আসব মা।

শমীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ধর্মশালা থেকে বাইরে বেরিয়ে বললাম, আপনার একা বেরুনো মা পছন্দ করেন না দেখছি। কি দরকার আসার। আমি বরং টিকিটের ব্যবস্থা করে জানাতাম।

শমী ম্লান হেসে বলল, মা বড় সেকেলে মানুষ। মায়ের কথায় কিছু মনে করবেন না।

না, মনে করিনি কিছু। তবু তাঁকে কষ্ট দেওয়া ঠিক নয়।

শমী কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল, আপনি একা এসেছেন? ভাল লাগে একা ঘুরতে?

একা মানুষের ভাল লাগা মন্দ লাগার প্রশ্ন আসে না।

শমী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, কেন, আপনার আর কেউ নেই?

আছে। মা বাবা ভাই বোন···

শমী এবার হাসল ছোট্ট করে। বলল, এ পথে আগেও এসেছেন, তাই না ?

হ্যাঁ।

ভাল লাগে আপনার ? শমী তাকাল আমার মুখে।

না হলে কি আসি বার বার ? কিন্তু আপনার ভাল লাগছে না ?

তেমন কিছু নয়। এত ঠাসাঠাসি মানুষ। থাকার জায়গা নেই, খাবার জায়গা নেই। এই ভীড় আমার ভাল লাগে না।

কিন্তু হিমালয় ?

কি জানি।

বাস-স্ট্যাণ্ডে এসে পড়লাম। গাদা-গাদা মানুষের ভীড় টিকিটঘর ঘিরে। অনেকেই মালপত্র নিয়ে রাতের আস্তানা গেড়েছে এখানে। বুঝলাম এই ভীড়ে কালকের টিকিট পাওয়া সম্ভব নয়। বাসের সংখ্যার চেয়ে যাত্রী বেশি হয়ে গেছে।

শমী বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, এত লোক! সবাই কেদারনাথ যাবে ?

মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে বললাম, তাই তো মনে হচ্ছে। যে কটা বাস আছে তাতে দু'দিন সময় লাগবে সব যাত্রীকে কুণ্ডাচটি পর্যন্ত নিয়ে যেতে।

বলেন কি? আমাদের যাওয়ার কি হবে কাল? টিকিট পাব না ?

অসম্ভব! কালকের দিনটা আপনাদের অপেক্ষা করতেই হবে। পরশুর টিকিট যাতে পাওয়া যায় তার চেষ্টা করছি।

কিন্তু আপনি তো কালই চলে যাচ্ছেন।

শমী বেশ চিন্তিত আর অধৈর্য হয়ে উঠছে।

আগে জানলে না হয় আপনাদের টিকিটের ব্যবস্থাও করতাম। এখন অবস্থা যা তাতে টিকিট পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

দেখুন না একটু চেষ্টা করে, যদি পাওয়া যায়। এত কাছে এসেও একটা দিন পড়ে থাকব?

চলুন, দেখি। তবে আশা নেই। বে-লাইনে চেষ্টা করাও সম্ভব নয়।

শমীকে নিয়ে ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম প্রায় কাউন্টারের কাছাকাছি। কোনো নির্দিষ্ট লাইন নেই। থাকলেও বোঝার উপায় নেই। এর মধ্যে যে কেমন ভাবে টিকিট সংগ্রহ করব বুঝতে পারছি না।

বুকিং-অফিস থেকে সমবেত যাত্রীর উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝেই মাইকে ঘোষণা হচ্ছে। শেষ বাসের বুকিং ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীরা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল বুকিং-কাউন্টারের ওপর।

ভীড়ের একটা ঢেউ এসে পড়ল আমাদের ঘাড়ে। শমী আমার কোমর জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠল। ওর দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিনবিন করে ঘামছে। আমারও একই অবস্থা।

চলুন, বাইরে বেরিয়ে যাই। আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

শমীকে এক হাতের মধ্যে আগলে ভীড় ঠেলে কোনো রকমে বাইরে বেরিয়ে এলাম। তারপর সিধে অলকানন্দার ধারে একটা পাথরের ওপর গিয়ে বসলাম।

শমী বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে তাকিয়ে অসহায়ভাবে বলল, আমরা তাহলে একা পড়ে থাকব এখানে?

ইচ্ছে নয় ওরা একাকী থাকুক এখানে। কিন্তু যাত্রীর যা ভীড় তাতে এ-ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। একমাত্র আমার যাত্রা বাতিল করে ওদের জন্য থেকে যেতে হয়।

অলকানন্দা নদীর নির্জন তীরে অনূঢ়া অপরিচিতা এক যুবতীর অসহায়তা আমার মনের দৃঢ়তার প্রাচীরকে অবশেষে ধসিয়ে দিল যখন শমী হঠাৎ আমার হাত ধরে মিনতি করে বলল, আমার দিকে তাকিয়ে অন্তত আপনি থাকুন। পরশু একসঙ্গে যাব।

কথা দিলাম।

কতক্ষণ শমী আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে হৃদয়ের উত্তাপ ছড়িয়েছিল খেয়াল নেই। খেয়াল যখন হল তখন রাতের গভীরতা বেড়েছে। অলকানন্দার উত্তাল স্রোতের সঙ্গীত আরও মুখর হয়েছে।

অনেক দেরি হয়ে গেছে। চল তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি। মা আবার ভাবছেন হয়তো।

আমার কথায় যেন তন্দ্রা থেকে জেগে উঠল শমী। তারপর আর দেরি না করে ধর্মশালার দিকে হাঁটা শুরু করল।

ধর্মশালার গেটের কাছে শমীকে ছেড়ে দিয়ে বললাম, আমার ফিরতে সামান্য দেরি হবে। একেবারে রাতের খাওয়া সেরে ফিরব। দরজা খুলে রেখো।

শমী মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে ধর্মশালার মধ্যে ঢুকে গেল।

বাজারের পথে ফিরতে গিয়ে নজরে পড়ল শমীর মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে। হয়তো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন। মহিলা বাতিকগ্রস্ত। মনে মনে হাসলাম।

হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে ধর্মশালায় ফিরলাম যখন, তখন রাত গভীর। অনেকেই শুয়ে পড়েছে। অনেকে তখনো শোবার আয়োজন করছে। পথের ধারের বাড়িগুলোর বারান্দায় দলে দলে মানুষ রাতের আস্তানা গেড়েছে। বাস-স্ট্যাণ্ডে অনেকেই শুয়ে-বসে। কেউ ঘুমচ্ছে অঘোরে, কেউ কথা বলে চলেছে সঙ্গীর সঙ্গে। কোথাও বা তুলসীদাসের রামচরিত থেকে সুর করে রামায়ণ পাঠ চলছে। যে ভাবেই হোক আজ রাতটা ভোর হলেই কাল যাত্রা শুরু। অনেকে চলে যাবে হিমালয়ের গহনে। অনেকে পড়ে থাকবে পরের দিন যাবার জন্য। নতুন যাত্রী আসবে পুরনো যাত্রীর দল ভারী করতে। হিমালয়ের পথে এ-এক বিচিত্র মিছিল।

ধর্মশালার গেট পার হয়ে সিঁড়ির কাছে আসতেই দেখলাম চৌকিদার খাটিয়ার ওপর বিছানা পেতে ঘুমের আয়োজন করছে। আমাকে দেখে হেসে বলল, কালকের টিকিট পাওয়া গেছে। বাসের ড্রাইভার সকালে আপনাকে ডেকে নিয়ে যাবে। একেবারে ড্রাই-ভারের পাশের ফ্রন্ট সীট।

চৌকিদারকে প্রথমে ধন্যবাদ জানালাম। তারপর বললাম, কাল যেতে পারছি না।

কেন বাবুজী? তবিয়ত ঠিক আছে তো? চৌকিদার উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল।

তা আছে, কিন্তু আমার ঘরে যে মাইজীরা আছে তাদের টিকিট পাওয়া যায়নি। কাল ওঁদের টিকিটের ব্যবস্থা করে পরশু যাব।

চৌকিদার যেন ক্ষুণ্ণ হল। বলল, সে আপনার মর্জি। তবে একটা কথা বলি কিছু মনে করবেন না বাবুজী, মাইজী সুবিধার নয়।

বুঝলাম কিছু একটা হয়েছে। মহিলার যা মেজাজ, কিছু বলেছে হয়ত ওকে। এখন শুনতে বসলে রাতের ঘুম নষ্ট। তাই এড়িয়ে যাবার জন্যে হাসলাম চৌকিদারের কথায়। বললাম, কাল থাকব কিন্তু।

চৌকিদারের জবাবের অপেক্ষা না করে ধর্মশালার দোতলায় উঠে এলাম। দেখলাম আমার ঘর বন্ধ। হয়তো শমীরা শুয়ে পড়েছে।

দরজায় আস্তে টোকা দিলাম।

কে? শমীর মায়ের গলা।

আমি, দরজাটা খুলুন।

এত রাতে? ভেতর থেকে যেন ধমক এলো একটা।

মনে মনে হাসি পেল। মায়ের জাতটাই এমন। ছেলে একটু রাত করে ফিরলে প্রথমে মায়ের ভাবনার অন্ত থাকে না, তারপর ধমক। অপরাধী গলায় বললাম, কই তেমন রাত তো হয়নি। হোটেলে ভীড় খেতে দেরি হয়ে গেল।

দরজা খুলল।

বাঘের মতো জ্বলজ্বলে দুটো চোখ আমার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করল। তারপর আমার বিছানা সজোরে আছড়ে পড়ল আমারই পায়ের ওপর।

ভীষণ চমকালাম!

বিকট শব্দ করে দরজার ভারী পাল্লা দুটো বন্ধ হয়ে গেল। ভেতর থেকে কাঠের হুড়কো লাগানোর আওয়াজ পেলাম।

দরজা বন্ধ হবার আগে আমার মুখ দিয়ে দুটিমাত্র শব্দ বের হল, এ-কি!

বন্ধ দরজার ওপার থেকে বাজখাঁই গলার স্বর ভেসে এল, বিছানা দিয়েছি, এবার বিদেয় হও।

বলে কি মহিলা! আমি তাজ্জব!

অনেক কষ্টে গলায় জোর এনে বললাম, আমার ঘরে আপনাদের থাকতে দিলাম। আর আমারই মালপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছেন? দরজা খুলুন।

গলা আরো চড়িয়ে মহিলা জবাব দিলেন, এত রাতে একলা মেয়েমানুষদের পেয়ে খুব গলাবাজী করছ দেখছি। ভেবেছিলাম ছেলের মতন, মতলব বুঝতে পারিনি। মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করার জন্যে ভালমানুষ সেজেছিলে। সোমখ মেয়ে নিয়ে বিদেশে এসেছি দেখে চোখ রাঙিয়ে তোমার মতলব সারবে? তোমাকে এ-ঘরে থাকতে দেব না। যা পার করোগে যাও।

রাগে দুঃখে অপমানে তখন আমার ধরণী দ্বিধা হও অবস্থা। এত কাল হিমালয়ে ভ্রমণ করছি, কিন্তু এমন অবস্থা তো হয়নি কখনো! মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করছে। দরজার বাইরে গভীর অন্ধকারে মুখ ঢেকে অসাড়ের মতো বিছানার ওপর বসে পড়লাম।

ভেতরে তখন মা-মেয়েতে তর্ক-বিতর্ক করছে। কানে আসছে মেয়ের কথা!

কাজটা খুব অন্যায় করলে মা। ভদ্রলোক আমাদের বিপদ দেখে

থাকতে দিলেন আর তুমি তাকে অপমান করে অমনভাবে বিছানা ফেলে দিলে···

তুই থাম। ভদ্রলোক কাকে বলছিস? চিনিস ভদ্রলোকদের? চোখ দেখলে বুঝতে পারি কে কেমন মানুষ। ওকে ঘরে ঢুকিয়ে শেষে বিপদে পড়ি।

কি বিপদে পড়বে তুমি? ভদ্রলোক চোর না ডাকাত?

ওরে চোর-ডাকাত তবু ভাল। তারা হয় চুরি না হয় ডাকাতি করবে। আর এরা সব—

থামো। উপকার যে করল তাকে অপমানের ফল পেতে হবে তোমায়। তোমার জন্যে ওঁর কাছে আমার মাথা কাটা গেল।

তা-তো যাবেই। ঋষিকেশ থেকেই দেখছি, ছোঁড়া পেছনে লেগে আছে। গায়ে পড়ে উপকার কেন করছে তা কি বুঝিনা? নাকি আমারও বয়েস যৌবন ছিল না?

গায়ে পড়ে উনি কোন উপকারটা করলেন তোমার? ঋষিকেশে ঘর যোগাড় না করে দিলে থাকতাম কোথায়? তুমি ঘরের কথা বলনি ওঁকে?

বলেছি, তাতে কি হয়েছে?

শমী ফোঁস ফোঁস করে আবার বলে, এখানেও তার ঘরেই শেষে উঠেছ। এটাও কি ভদ্রলোক যেচে তোমায় দিয়েছেন?

মহিলা একটু থতমত খেলেন যেন। তারপর দ্বিগুণ গলা চড়িয়ে বললেন, এমনি দেয়নি বুঝলি। কেন দিয়েছে তা যদি তোর বোঝার ক্ষমতা থাকতো তাহলে একা ঢ্যাং-ঢ্যাং করে ছোঁড়াটার সঙ্গে সন্ধেবেলায় টিকিট কাটতে যেতিস না।

মা! তুমি কি বলছ? ছিঃ ছিঃ। ভদ্রলোক শুনলে কি ভাববেন বলো তো? তোমার মন এত নিচু? এত সন্দেহবাতিক! আমাকেও তুমি বিশ্বাস করো না?

শমীর এ-কথায় মহিলা বোধহয় আহত হলেন। খানিক চুপ করে

থেকে বললেন, মন আমার নিচু কি না জানি না। তবে বিশ্বাস আমি কাউকে করি না। আগুনের পাশে ঘি রাখলে কি মা বিশ্বাস করা যায়? সন্দেহবাতিক আমার হয়েছে বাধ্য হয়েই।

খানিক বিরতি। কান সজাগ আমার। ভদ্রমহিলা কেন যে এত সন্দেহবাতিক তা জানতে হবে।

মহিলা ইনিয়ে-বিনিয়ে খানিকটা স্বগতোক্তির মতো বলতে লাগলেন—তোর বাপ যখন মারা যায় তখন আমার বয়েস তোর মতই। সাধ-আহ্লাদ কিছুই মেটেনি। মিথ্যে বলব না, মনে মনে সাধ হত কত। ভাবতাম সমাজ আমার সব কেড়ে নিল। তবে হ্যাঁ, মায়ের মতো মা ছিল আমার। তিন সন্ধ্যে আহ্নিক করে তবে জল খেত মা। বিধবা হয়ে যখন মার কাছে এলুম তখন রাগ আমার সবার ওপর। মা-র কাছেই সীতা-সাবিত্রীর গল্প শুনে আর তিন সন্ধ্যে আহ্নিক জপ-তপ করেই না ভেতরের আগুন নেবালুম। বয়েসকালে কম ছেলে-ছোকরা আমার চারপাশে ছোঁক-ছোঁক করত! মিথ্যে বলব না, প্রথম প্রথম আমারও ভাল লাগত, লোভ হত। শেষে বুঝলাম, আমি হিন্দু-ব্রাহ্মণঘরের বিধবা। ভাল লাগা আর লোভ হওয়া পাপ। এ-জন্মে পাপ করলে যে পরজন্মে নরকে যেতে হবে। নরক-যন্ত্রণার ছবি দেখে গা শিউরে উঠত। তারপরই না শরীরের গরম গেল।

খানিক বিরতির পর মহিলা বলতে লাগলেন, ছেলেটার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে আমারই কি ভাল লেগেছে? যাই হোক, বাঙ্গালী ছেলে। বিদেশে উপকার করেছে। কিন্তু তোর গায়ে-পড়া ভাব দেখে বুক কেঁপে কেঁপে উঠেছে আমার। নিজের ছোটবেলার কথা মনে হয়েছে। আমারও যে অমনটা হয়েছিল। মা তীর্থ ঘুরিয়ে মনের সেই ভাব কাটিয়ে দিয়েছিল। আর এ জন্যেই না এককাঁড়ি টাকা খরচ করে তোকে কেদার-বদরী এনেছি।

শমী কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। নিস্তব্ধ শৈলপুরীতে তার কান্না আমার রাগ-অপমান আর ক্ষোভের আগুনে যেন জল ঢেলে দিল।

শমীর মায়ের গলা আবার শোনা গেল, সাধে কি আর এমন করছি মা? তোর রূপ, তোর শরীরে আগুন থাকতে যে আমার চোখ বোজার উপায় নেই। আমার মতো তোরও যে কোনো সাধই মেটে নি। আমার তবু তুই ছিলি, তোর কি আছে মা? লোভের আগুনে তুই যে আগে পুড়বি। আমি মা হয়ে তোর পোড়া দেখব কেমন করে?

মা, তুমি চুপ করবে…

শমী হু-হু কান্নায় ভেঙে পড়ল।

আমি স্তব্ধ বিমূঢ়ের মতো বসে থাকলাম গভীর এক রাতের বেদনাময় নাটকের নীরব শ্রোতা হয়ে।

কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ আর বদরীনারায়ণ দর্শন করে ফিরছি হেঁটে যোশীমঠের দিকে। পথ-পরিক্রমায় ক্লান্ত হলেও তীর্থের সুফল লাভের কল্যাণে মন আমার ভরে আছে পরিপূর্ণ আনন্দে।

ঘাটচটি থেকে বেরিয়ে দোকান-পাট-ধর্মশালার পাশ দিয়ে বড়-রাস্তায় পড়ার মুখে থমকে দাঁড়ালাম। কে যেন ডাকল।

পিছন ফিরতেই একটা বড়রকম ঝাঁকুনি খেলাম। যাকে দেখছি সামনে তাকে যে আবার দেখতে পাব তা মনে-প্রাণেও ভাবি নি বা আশা করি নি। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার—সে একা!

রুদ্রপ্রয়াগে অলকানন্দা নদীর তীরের সেই বিশেষ সন্ধ্যার স্মৃতি আমার মনে পড়ছে। আমার দুটো হাত জড়িয়ে ধরে হৃদয়ের অনেক কথা অনেক উত্তাপ নির্বাক ভরে দিয়েছিল। ওকে কথা দিয়েছিলাম, ওদের জন্য পরদিন থাকব রুদ্রপ্রয়াগে। কিন্তু কথা রাখতে পারিনি শেষ পর্যন্ত। সন্ধ্যায় মধুর স্মৃতির পর রাতের ঘটনা এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। পরদিন ভোরের আলো ফোটার আগে সবার অলক্ষ্যে কেদারনাথের বাসে পালিয়েছিলাম রুদ্রপ্রয়াগ ছেড়ে।

কি খবর? হেসে জিজ্ঞাসা করলাম।

আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য ডাকলাম পিছনে।

শমী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

আমার মা বাল্যবিধবা, তাই বড় সন্দেহবাতিক ওঁর। সেদিনের ব্যাপার বড় বিশ্রী, বড় লজ্জাকর···আমি মায়ের হয়ে ক্ষমা চাইছি।

না, না, ক্ষমা চাইবার কি আছে? যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এখন আর ওসব নিয়ে ভেবো না। আমি ভুলেই গেছি।

কুণ্ঠাজড়ানো গলায় শমী বলল, আপনি ভুললেও আমি তো ভুলতে পারছি না। ছিঃ ছিঃ বড় লজ্জা···

ছাড়ো তো। তা তোমার মা কোথায়?

মায়ের অসুখ। নিচে চটিতে আছে।

কি হয়েছে?

জ্বর আর আমাশা।

ডাক্তার দেখিয়েছ?

ডাক্তার কোথায় পাব?

কেন? সরকারী ডাক্তার তো রয়েছে বাজারে। চল, আমি ডাক্তার নিয়ে যাচ্ছি।

আমার প্রস্তাবে খুশি হবার পরিবর্তে শমী মিইয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, ধন্যবাদ। আপনাকে আর আটকাব না। আমি বরং খুঁজে নেব'খন।

কেন, অসুবিধে কি?

না অসুবিধে কিছু না। আসলে মায়ের সন্দেহবাতিক। আপনাকে দেখলে আবার যদি···

কথাটা শেষ করতে পারল না শমী। লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইল যেন।

ওর মায়ের সেদিনের কথাগুলো মনে পড়ল হঠাৎ।···তোর রূপ তোর আগুন না নেভা পর্যন্ত আমার চোখ বোজার উপায় নেই। আমার তবু তুই ছিলি, তোর কে আছে?···

ভেতরে ভেতরে আবার একটা ঝাঁকুনি খেলাম।

শমী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। ওর মাথার একরাশ কালো চুলের মাঝখানে সিঁথিটা যেন বড় বেশি সাদা—এত সাদা সিঁথি এমন বয়েসের মেয়ের মানায় না। হাতের দিকে নজর পড়তে দেখলাম দু'গাছা সরু সোনার চুড়ি—রিক্ততার সাক্ষ্য!

এই মুহূর্তে যৌবনের প্রাচুর্যে ভরা একটি যুবতীর নিঃস্ব-রিক্ত অসহায় রূপ দেখে বেদনায় মূক হয়ে গেলাম।

॥ দুই ॥

নন্দনবন কোথায় ?

ভাগীরথীর উৎসমুখ গোমুখী ছাড়িয়ে গৈরিক বসনা গঙ্গোত্রী হিমবাহের পাথর আর বরফের রাজ্য পার হয়ে দিগন্ত যেখানে হেলে পড়েছে ভাগীরথী পর্বতের মাথায়—সেখানে নন্দনবন।

পাথর বরফের রাজ্যে আবার বন আছে নাকি ?

আছে বইকি।

সে কেমন বন ?

সে বনে বিশাল মহীরুহ না থাকলেও সবুজের অভাব নেই। নন্দনবনের সবুজ অঙ্গনে অফুরন্ত সবুজ ঘাস আছে। সবুজ ঘাসের মাথায় নানা রঙের পপি ফুল রঙের হাট বসায় বর্ষাকাল থেকে হেমন্তকাল পর্যন্ত। পাথরের গায়ে আছে জুনিপার ঝোপ—পাহাড়ী মানুষ বলে ধূপ গাছ। ধূপ ঝোপের শক্ত পাতার গা বেয়ে যখন হিমেল হাওয়া বয় তখন ধূপের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে উপত্যকায়। তুষারাবৃত পর্বতমালা ভয়ংকর হিমবাহ দিয়ে ঘেরা সবুজ এই উপত্যকা ফুলের সাম্রাজ্য। দেবতারা এখানে আসেন অবসর যাপনে। তাই এ-উপত্যকার নাম নন্দনবন।

কোন পথে যেতে হবে নন্দনবনে ?

পথ আর কোথায় ? গোমুখী পর্যন্ত তবু পথ বলে একটা বস্তু আছে। তারপরই হিমবাহ। বড় বড় পাথরে ঢাকা জমাট তুষার নদী। পাথরের সাম্রাজ্য ছাড়ালেই যে রেহাই পাওয়া যাবে তা নয়। আসবে তুষার আর বরফের দেশ। সে-সব অতিক্রম করার পর সীমাহীন গেরুয়া আর সাদা রঙের মধ্যে সবুজের বিচিত্র শ্যামলিমা নজরে পড়বে। চোখ জুড়িয়ে যাবে।—সে পথই নন্দনবনের পথ।

ও-পথে পারে সবাই যেতে ?

সবাই না পারুক অনেকেই পারে।

আমি পারব ?

নয়না বৌদির প্রশ্নে চমকালাম।

কি জবাব দেব ? পারবে বললে দায়িত্ব এসে পড়বে আমারই ঘাড়ে। পারবে না বললে—যাতে পারে তার শেষ চেষ্টা করবে। বড্ড একরোখা মেয়ে এই নয়না বৌদি।

উত্তরে (থুড়ি পশ্চিমে, যদিও গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী উত্তর ভারতে তবু বাঙালী কলকাতা ছাড়লেই মনে করে পশ্চিমে বেড়াতে চলেছে। পশ্চিমাঞ্চল মধুপুর দেওঘর ইত্যাদি ইত্যাদি আমাদের মজ্জায় মিশে দিক ভুল করিয়ে ছেড়েছে।) কদিনের অবসর যাপনের জন্য নয়না বৌদি সরকার মশাইকে নিয়ে বাঙালীর অতি পরিচিত হরিদ্বার-হৃষীকেশে এসেছিল। আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ওদের গঙ্গোত্রা ভ্রমণ। না হলে গঙ্গার উজান দেখে খেয়ে ঘুমিয়ে বেশ কেটে যেত। উৎসমুখ গোমুখী দেখানোর যন্ত্রণা ভোগ করতে হত না আমায়। যন্ত্রণা ওদের যত না, তার চেয়ে অনেক বেশি আমার যেন।

হৃষীকেশের বাজারে আলাপ সরকার মশায়ের সঙ্গে। বাংলাদেশে বাঙালী মুখচোরা হলেও বিদেশে ও বদনাম দেবে না কেউ। বরং বিদেশে পৌঁছেই বাঙালী বাঙালীকে খোঁজে। এমনভাবেই হৃষী-কেশের বাস-স্ট্যাণ্ডে আলাপ হয়েছিল সরকার মশায়ের সঙ্গে। নাম-ধাম পরিচয় এবং গন্তব্যস্থল জানার পর বেশ খুশি হয়ে বলেছিলেন, আপনার নামটা যেন চেনাচেনা লাগছে। খবরের কাগজে ছবিটবিও দেখেছি মনে হচ্ছে।

আমি নিশ্চুপ হেসেছি। কবে কোথায় একটা ছবি ছাপা হয়েছে যা নিজের ছাড়া আর কারো পক্ষে স্মরণে রাখা সম্ভব নয় তাই এখন ওঁর মনে হচ্ছে—এটা খেজুরে আলাপেরই অঙ্গবিশেষ। আমার চুপ

করে থাকা ছাড়া আর উপায় কি! আলাপের মুখপাতের পরই সরকার মশাই আমায় জবরদস্তি টেনে এনেছিলেন ওঁদের গোলাবকোঠী ধর্মশালার আস্তানায়।

বলেছিলাম, আজ থাক। কাল বরং সকালে যাব আপনার ওখানে।

আরে মশাই, আপনি হলেন মাউণ্টেনীয়ার। কত কাজ আপনাদের। কাল সকালে যদি ধরতে না পারি তাহলে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারব না। এমন একটা চান্স ছাড়ি কখনো ?

ঘরের দরজার কাছে এসে উচ্ছ্বসিত হাঁক দিয়েছিলেন সরকার মশাই, নয়না, দেখ কাকে ধরে এনেছি।

ঘরের দরজা খুলে নয়না নামের যে মহিলা দাঁড়াল সামনে তাকে কন্যা না হলেও সরকার মশায়ের স্ত্রী বলে মনে হয়নি আমার। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের এক রূপসী স্বাস্থ্যবতী মহিলা নয়না পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের সরকার মশায়ের স্ত্রী হল কেমন করে সেটাই আশ্চর্য লেগেছিল আমার।

নয়না আমার মুখে হাঁ করে তাকিয়েছিল। মুখের রেখায় হয়ত পরিচয়ের নামাবলী অন্বেষণ করছিল।

হাঁ করে দেখছ কি?—মাউণ্টেনীয়ার মানে পর্বতারোহী। হ্যাঁ-হ্যাঁ বাবা, যে-সে লোক নয়। একেবারে খবরের কাগজের ছবিঅলা নায়ক। কলকাতার বাঙালী। এমন মানুষ বিদেশে পাওয়া ভাগ্য, বুঝলে ? অভ্যর্থনা কর।

সরকার মশায়ের কথায় বিব্রত হয়ে বললাম, ওসব কিছু না।

সরকার মশাই এবার নয়নার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে আমায় বললেন, উনি মানে নয়না, আমার হৃদয়েশ্বরী মানে ওয়াইফ্‌।

আমি হাতজোড় করে নমস্কার করলাম।

নয়না সলজ্জ হেসে বলল, উনি বড্ড পেছনে লাগেন।

সরকার মশাই মুচকি হেসে বললেন, অপবাদ দিও না। পেছনে নয় আমি সামনেই লাগি। আমার লুকোচুরি নেই।

এই কি হচ্ছে বল তো! নয়না স্বামীকে ধমক দিয়ে আমায় ঘরে এনে বসাল। সরকার মশাই উধাও হলেন অতিথি সৎকারের আয়োজনে।

কথায় কথায় নয়নাদের ভ্রমণসূচী জানলাম। ওরা হরিদ্বার দেখে হৃষীকেশ এসেছে। এরপর যাবে দেরাদুন। সেখানে দু'এক দিন থেকে যাবে মুসৌরী। ফেরার পথে বেনারস আর গয়া হয়ে কলকাতা। আমার গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করল নয়না। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি? কতদিন থাকব ইত্যাদি।

গঙ্গোত্রী-গোমুখীর নাম শুনলেও শোনেনি নন্দনবনের নাম।

নয়না জিজ্ঞাসা করল, আমরা যেতে পারব গঙ্গোত্রী?

বললাম, নিশ্চয় পারবেন, আজকাল হাঁটা পথ তো কমে গেছে।

তাহলে আমরাও যাব। সঙ্গে নেবেন আমাদের?

আপত্তি নেই। তবে ফেরার সময় আপনাদের একা ফিরতে হবে।

কেন?

আমাকে আরো ওপরে গোমুখী হয়ে নন্দনবন যেতে হবে।

তারপর?

তারপরে অজানা পথ। অজানা পর্বতশিখর খুঁজে বার করতে হবে।

অজানা পথ! মানুষজন নেই ওখানে?

হাসলাম। বললাম, মানুষজন তো দূরের কথা, পশু-পাখিও নেই।

কি আছে তাহলে?

আছে আকাশছোঁয়া তুষারঢাকা পর্বতশিখর, নীল আকাশ, সাদা বরফ আর পাথর।

নয়নার চোখে বিস্ময় চিকিয়ে উঠল। টানা বড় বড় পদ্মপাপড়ির মতো চোখ জোড়া মেলে বলল, অমন জায়গায় গিয়ে কি লাভ? যেখানে মানুষজন নেই—দেখার মতো কিছু নেই।

লাভ-লোকসান বোঝাতে বসলে অনেক কথা বলতে হয়। তাই চুপ করে থাকলাম।

সরকার মশাই এক ঠোঙা খাবার নিয়ে এসে পড়ায় নয়নার প্রশ্নের হাত থেকে বাঁচলাম।

সরকার মশাই আর নয়না বৌদি আমার ভ্রমণ সঙ্গী হয়েছেন সেই থেকে।

দুদিন বাদে হৃষীকেশ থেকে বাসে টেহরী হয়ে উত্তরকাশী এসেছি। উত্তরকাশীতে এসে আমায় আটকা পড়তে হয় রেস্ট্রিকটেড এলাকায় যাওয়ার পারমিট সংগ্রহ করার জন্য। সরকার মশাইকে বললাম, আমাকে ক'দিন অপেক্ষা করতে হবে এখানে। আপনারা বরং গঙ্গোত্রী ঘুরে আসুন।

জবাবে সরকার মশাই নয়না বৌদিকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, মালিক উনি। ওকেই বল ভায়া।

নয়না বৌদিকে বললাম কথাটা।

মিষ্টি হেসে নয়না বৌদি বলল, আমাদের কাছে উত্তরকাশীও নতুন। তা ছাড়া আপনার সঙ্গে এসেছি আলাদা হবার জন্যে তো নয়। কাজ শেষ হলে গঙ্গোত্রী যাওয়া যাবে।

তিনদিন উত্তরকাশীতে ছিলাম সরকারী ডাক বাংলোর একটি ঘরে। আলাদা থাকতে চেয়েছিলাম ওদের অসুবিধে হবে ভেবে। কিন্তু আমায় ওরা আলাদা থাকতে দেয়নি।

এই তিন দিনে সরকার মশাই ভাগীরথীর তীরে আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে দিন-রাতের বেশির ভাগই কাটিয়েছেন। আর নয়না বৌদি আমার সঙ্গী হয়ে কখনো জেলা শাসকের দফ্‌তরে কখনো

নেহেরু পর্বতারোহণ শিক্ষা কেন্দ্রে আবার কখনো গোধূলীবেলায় ভাগীরথীর তীরে বসে নদীর কলোচ্ছ্বাস শুনেছে।

বিকেলের দিকে ভাগীরথীর উপল বেছান তীরভূমির ওপর নয়না বৌদি আমার পাশে পাশে হেঁটে নিজের কথা নিজের বাপ-মা আর দেশের কথা বলেছে। কখনো স্বামী আর স্বামীর ঐশ্বর্যের উদারতার কথা বলেছে। জেনেছে খুঁটিয়ে আমার কথা। জেনেছে আমার বাবা-মা ভাই-বোনের কথা। বিয়ে করিনি কেন সে কথাও বাদ যায়নি। এক কথায় আমিও তিনদিন নয়না বৌদির মেয়েলী কথার দোসর হয়ে পড়েছিলাম। হয়ত আমাদের বয়সের সমতার কারণে ওর মধ্যে নিজের ছায়া দেখেছিলাম।

সময়ে সময়ে ভুলে গেছি নয়না বৌদি সরকার মশাইয়ের স্ত্রী। আমার সঙ্গে ওদের পরিচয় মাত্র ক'দিনের। সমবয়েসী বন্ধুর মতো ঘুরেছি-ফিরেছি, ভাগীরথীর উপল বেছানো তীরে বসে অনেক আবোল-তাবোল বকেছি। নয়না যে মেয়ে তাও বিস্মৃত হয়েছি কখনো।

নয়না বৌদির সহজ সরলতায় অপরিচয়ের বাধা কখন যে অতিক্রম করে গেছি মনে পড়ে না।

শেষ দিন বিকেলে আনন্দময়ী আশ্রম থেকে বেরিয়ে ভাগীরথীর তীর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নয়না বৌদি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল এক সাধুর কুঠিয়ার সামনে। আমার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে হঠাৎ বলল, আজ থেকে আর আপনি নয়—তুমি। কি, রাজি তো?

তুমি কি?

আমাকে আর আপনি টাপনি বলবেনা। তুমি বলবে। বুঝেছ?

মাথা হেলিয়ে সায় দিলাম।

আর একটা কথা, নাম ধরে ডাকবে। বৌদি টৌদি ভাল লাগে না।

আমি চুপ।

কি গো ? নাম ধরে ডাকবে তো ?

ডাকব, তবে আড়ালে।

আড়ালে কেন ?

সরকার মশাই যদি কিছু মনে করেন।

ধ্যুস ! ও কিছু মনে করবে না। না হলে তোমায় ও একদিনে নাম ধরে তুমিতে নামিয়ে দেয়।

সেদিন থেকে নয়না বৌদি কেবল নয়না। অবশ্য সরকার মশায়ের আড়ালে। যদিও নদীর ধারের সেদিনের সব কথাই বলেছিল নয়না সরকার মশাইকে এবং সরকার মশাই সানন্দে রাজি হয়ে বলেছিলেন, তথাস্তু। তুমি তুই ছাড়া সখ্য হয় না। তুমি নয়নাকে নাম ধরেই ডাকবে, বুঝলে ভায়া ?

তিনদিন বাদে সরকারী ছাড়পত্র পেয়ে গঙ্গোত্রীর বাসে চেপে বসলাম।

গ্রাম-গঞ্জ পাহাড়-অরণ্য ছাড়িয়ে ভাটোয়ারী, হরসিল হয়ে লংকায় বাস থামল। এখান থেকে পায়ে হাঁটা পথ মাত্র দু'মাইল ভৈরব ঘাটি। ভৈরব ঘাটিতে আবার বাস পাওয়া যাবে গঙ্গোত্রীর।

বাস থেকে নেমে কুলি যোগাড় করে মালপত্র নিয়ে পায়ে হাঁটা শুরু করলাম।

লংকা থেকে ভৈরব ঘাটি প্রায় হাজার ফুট উঁচু। পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে তৈরি পথ—সিঁড়ির মতো উঠে গেছে আকাশের দিকে এক নিশ্বাসে।

আগে আমি তারপর নয়না এবং শেষে সরকার মশাই। যাত্রার শুরুতেই সরকার মশাই শুরু করলেন রসিকতা।

ভায়া এ যে দেখি স্বর্গের সিঁড়ি। স্বর্গপ্রাপ্তি হবে তো ?

বললাম, চলার সময় কথা বলবেন না দাদা। দম ফুরিয়ে যাবে।

সেটাই তো চাই ভাই। দম থাকলে তো আর স্বর্গলাভ হবে না।

নয়না বৌদি ধমকে ওঠে, বড্ড বাজে কথা বলছ। দেখছ পথের কি অবস্থা আর এখন যতসব অলুক্ষুণে কথা···

স্ত্রীর ধমক খেয়ে চুপ করেন খানিক তারপর আবার শুরু করেন। এমন ভাবে চলতে চলতে এক সময় ভৈরব ঘাটির কঠিন পথ শেষ হল। বিস্তীর্ণ এক সমতল প্রাঙ্গণে এসে বসে পড়লাম সবাই।

ভৈরব ঘাটিতে ভৈরবনাথের মন্দির ছাড়া আর দর্শনীয় কিছু নেই। বাস-স্ট্যাণ্ড আর দোকানপাট নিয়ে সাময়িক আস্তানা। যাত্রার মরশুম ফুরলেই ভৈরব ঘাটি জনশূন্য হয়ে যাবে।

খানিক বিশ্রাম নিয়ে বাসের মাথায় মালপত্র তুলে বাসে চেপে বসলাম। এখান থেকে গঙ্গোত্রী মাত্র ছ' মাইল পথ। উচ্চতাও মাত্র হাজারখানেক ফুট বেশি।

মসৃণ আঁকাবাঁকা পথে বাস ছুটতে থাকে। টপগীয়ারের একটানা গোঁ-গোঁ শব্দে কানে তালা ধরছে। ভৈরব ঘাটির পর থেকেই হিমেল হাওয়া বইছে। সরকার মশাই আর নয়না বৌদি গায়ে শাল চাপিয়েছে। যাত্রীরা মাঝে মাঝেই 'গঙ্গা মাইকী জয়' ধ্বনি দিচ্ছে। বাসের পিছনের সিটের একদল রাজস্থানী যাত্রী গঙ্গাস্তোত্র সুর করে চড়া গলায় গেয়ে চলেছে। গঙ্গোত্রীর অরণ্য-প্রকৃতি বড় শ্যামল। জানালার বাইরে চেয়ে চোখ জুড়িয়ে যায়। বড় বড় পাইন দেবদারু চীর রডোডেনড্রন এবং বন্য গোলাপের ছায়ায় বাসপথ এগিয়ে গেছে মন্দিরের কাছাকাছি। সারা অঞ্চলে অদ্ভুত মাদকতাপূর্ণ বনজ গন্ধ।

পাইন আর রডোডেনড্রনের অরণ্যলোক পেরিয়ে যখন গঙ্গোত্রী পৌঁছলাম তখন গোধূলীর হলুদ আলোয় গঙ্গোত্রী ঝলমল করছে।

দশ হাজার ফুট উঁচু গঙ্গোত্রীতে ধর্মশালা, সরকারী বিশ্রামভবন, সাধু-সন্তদের অতিথিশালা, মন্দির কমিটির বাড়ি ইত্যাদি মিলিয়ে অঢেল থাকার ব্যবস্থা। সবই কাঠের বাড়ি। কিছু কিছু পাথরের গাঁথুনিও আছে।

বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে মন্দিরের কিছুটা ওপরে পথের পাশেই সারি সারি ধর্মশালা।

কালীকম্বলী ধর্মশালায় থাকার জায়গা পেলাম। বড়সড় একটা ঘর। পাশাপাশি তিনটে বিছানা পড়ল।

বিছানায় পা ছড়িয়ে বসে নয়না বৌদির তৈরি গরম চা পান করে তাজা হয়ে উঠলাম। নয়না বৌদি চা খেল না। মা গঙ্গার দর্শন না করে চা-জল পান করবে না।

নয়না বৌদি জিজ্ঞেস করল, মন্দিরে যাবে তো?

সরকার মশাই মাথা নেড়ে বললেন, না। মাকে এখান থেকে প্রণাম সেরে নিলুম। অতটা পথ নামা-ওঠা করার শক্তি আর নেই। তোমরা যাও, আমি বরং চৌকিদারের কাজ করি।

তাহলে তোমরা একটু বাইরে যাও, আমি তৈরি হয়ে নিই।

সরকার মশাইকে নিয়ে ধর্মশালার খোলা আঙিনায় এসে দাঁড়ালাম। ধর্মশালা ভাগীরথী নদী থেকে প্রায় দু-তিনশ ফুট ওপরে। মন্দিরও প্রায় শ'খানেক ফুট নিচে। সে কারণে এখান থেকে গঙ্গোত্রীর সুবিশাল একটা সুন্দর চিত্র নজরে পড়ে।

গঙ্গোত্রীর বিস্তীর্ণ উপত্যকার দু'ধারে দুটি বিশাল পর্বত প্রাচীর। এই প্রাচীরের মধ্য দিয়ে গোমুখী থেকে আগত ভাগীরথী গঙ্গা প্রবাহিত। গঙ্গার ডান দিকের তীরে ভগবতী গঙ্গার স্বর্ণ-মন্দির তপোময় তপভূমির গৌরব বাড়িয়েছে।

নদীর উভয় তীরে ধর্মশালা এবং সাধু-সন্তদের আশ্রম। নদীর বামদিকের তীরে তপস্বীদের ছোট-বড় কুঠিয়া। এ-পারের সঙ্গে ওপারের সংযোগ হয়েছে সেতুর দ্বারা।

খানিকবাদেই নয়না বৌদি বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। পরনে দামী গরদের লাল পেড়ে শাড়ি আর গায়ে আকাশী রঙের কাজকরা দামী কাশ্মীরী শাল। অদ্ভুত মানিয়েছে!

সরকার মশাই হাঁ করে নয়না বৌদির দিকে খানিক তাকিয়ে

থেকে রসিকতা করে বললেন, এ সাজে কোথায় চললে? দেখো, সাধুবাবাদের জপতপের বারোটা না বাজে।

নয়না বৌদি স্বামীর প্রতি কটাক্ষ হেনে বলল, মন্দিরে মায়ের কাছে যাচ্ছি আর তুমি অ-কথা কু-কথা বলতে শুরু করলে।

যা সত্যি তা বললাম। আমারই চোখ ঠিকরোচ্ছে আর অন্যের যে কি হবে তাই ভাবছি!

থাক, খুব হয়েছে। ঘরে গিয়ে বস। বাইরে আবার যেন ঠাণ্ডা লাগিয়ে বস না। নয়না বৌদি বেশ খুশি খুশি হয়ে বলল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি যাবে তো?

চলো।

নয়না বৌদিকে নিয়ে উৎরাই পথে মন্দিরের দিকে যাত্রা করলাম। পাথর পাশাপাশি সাজিয়ে আঁকা-বাঁকা উঁচু-নিচু পথ। পথের দুধারে দোকান পাট। দোকানের মধ্যে বেশির ভাগই চা আর মিষ্টির। মাঝে মাঝে ডালার দোকানে পুজোর উপকরণ বিক্রি হচ্ছে।

নদীর ওপারে যাওয়ার পুল ডাইনে রেখে আমরা মন্দিরের পথে বাঁক নিতেই এক পাণ্ডা পূজারী এসে ধরল মা গঙ্গার পুজো করিয়ে দেবে বলে।

পূজারী পাণ্ডাকে পুজোর উপকরণ আনতে বলে আমরা মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

বড় সঁড় একটা তোরণ পার হয়ে চৌকো পাথর সাজানো বিশাল মন্দির চত্বর। প্রধান মন্দির গঙ্গাদেবীর। মন্দিরে যমুনাদেবী, সরস্বতী, ভগীরথ ও শ্রীশংকরাচার্যের মূর্তি আছে। বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেন জয়পুরের রাজকুমার অমর সিং থাপা। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মন্দিরের নির্মাণ কৌশল দর্শনীয়। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেখি পূজারী সন্ধ্যারতির আয়োজন করছেন। দেবী গঙ্গার নিরাভরণ মূর্তিকে ভক্তিভরে প্রণাম করল নয়না বৌদি।

পূজারী পাণ্ডা পুজোর উপকরণ নিয়ে এসে হাজির। মন্দিরের

এক পাশে নয়না বৌদিকে বসিয়ে পুজো সারল তড়িঘড়ি। সন্ধ্যা-আরতির সময় হয়ে গেছে—এ সময় পুজো অচল। এ-কারণেই পাণ্ডাজীর ব্যস্ততা।

পুজো শেষ হতেই শুরু হল আরতি। পূজারী অপূর্ব ভঙ্গিতে গঙ্গাদেবীর আরতি করলেন। যাত্রীর ভীড় না থাকায় আমরা চোখ-ভরে সন্ধ্যারতি দেখলাম।

মন্দির থেকে বেরিয়ে নয়না বৌদি বলল, এখানে গঙ্গার মন্দির হল কেন? জায়গার মাহাত্ম্য কি বল না?

সংক্ষেপে গঙ্গোত্রীর মাহাত্ম্য বললাম। বললাম, সগররাজার ষাট হাজার পুত্রের মুক্তির জন্য এই গঙ্গোত্রীতেই ভগীরথ একটি শিলার ওপর দীর্ঘকাল তপস্যা করে গঙ্গাকে মর্তে এনেছিলেন।

সেই শিলা এখনো আছে? নয়না বৌদি জিজ্ঞেস করল।

আছে, নিচে গঙ্গার তীরে। ভগীরথ-শিলা নামে বিখ্যাত। ওখানে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-তর্পণ হয়।

এখান থেকে কত দূরে ভগীরথ-শিলা।

কাছেই। কাল দেখিয়ে আনব। বললাম।

আজই চলো না। নয়না বৌদি আমার হাত ধরে অনুরোধ জানাল।

এই ঠাণ্ডায়। বল কি?

আহা, এমন কি ঠাণ্ডা? চলো দেখে আসি।

নয়না বৌদির জেদ আমার জানা আছে, তাই আর আপত্তি না করে গঙ্গার দিকে পা বাড়ালাম।

পাথর ডিঙিয়ে গঙ্গার তীর ধরে খানিক হাঁটার পরই ভগীরথ-শিলার কাছে এসে পড়লাম। সন্ধ্যা হলেও উচ্চ হিমালয়ে অনেক রাত পর্যন্ত আলোর অভাব হয় না। তেমন ভালো দেখা না গেলেও শিলা দেখতে কোনো অসুবিধা হল না। পাশেই ভাগীরথী নদীর কুলকুল ধ্বনি। জলের রিমঝিম শব্দ ছাড়া আর সবই নিঃশব্দ।

আকাশের এক কোণে এক ফালি চাঁদ উঠছে। দূরের হিমঢাকা পর্বতশিখরগুলো মেঘের মতো আকাশের গায়ে লেপটে আছে। নদীর ওপারে পাইন চীর ভূর্জ আর রডোডেনড্রন বৃক্ষের নিবিড় বনানী অন্ধকারের গর্ভে বিলীন।

আমরা দুটো প্রাণী ছাড়া আর কেউ নেই। এক নিঃসীম শূন্যতা বিরাজ করছে চারদিকে।

ভগীরথ-শিলার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, নয়না, এই হল ভগীরথ-শিলা। এখানে বিদেহী আত্মার শ্রাদ্ধ-তর্পণ করলে তার সদ্গতি হয়। অনেক যাত্রী তাই এখানে শ্রাদ্ধ-তর্পণ করে।

নয়না বৌদি নির্বাক তাকিয়ে আছে শিলার দিকে।

এখানেই ভগীরথ তপস্যা করে গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে মর্তে এনেছিলেন। এই ভাগীরথী নদী পরে গঙ্গা নাম নিয়ে আমাদের গঙ্গাসাগরে মহাসমুদ্রে মিলেছে।

নয়না প্রস্তরীভূত। ওর সাড় নেই। স্পন্দনহীন এক জড় পদার্থের মতো দাঁড়িয়ে আছে ভগীরথ-শিলার সামনে। ওর মন হয়ত এই মুহূর্তে অন্য কোনো জগতে পাড়ি দিয়েছে। কি ভাবছে, কার কথা ভাবছে জানি না।

কাঁধে হাত রেখে ডাকলাম, নয়না!

অনেক দূর থেকে যেন জবাব এল, এ্যাঁ!

কি ভাবছ?

ভাবছি সগররাজার ষাট হাজার পুত্র মুক্তি পেয়েছিল এই গঙ্গার জন্যে, তাই না?

হ্যাঁ।

এখানে তর্পণ করলে বিগত আত্মার কল্যাণ হয়?

তাই তো বলে সবাই।

এখানে প্রার্থনা করলে হারিয়ে যাওয়া মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায়?

নয়নার প্রশ্নে আমি সচকিত। কোন প্রিয়জন ওর হারিয়ে গেছে ?

নয়না আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গভীর আকর্ষণে আমায় জড়িয়ে ধরল। তারপর মুখের সামনে মুখ রেখে আকুলভাবে প্রশ্ন করল, এই, বল না ! হারিয়ে যাওয়া মানুষের খোঁজ পাওয়া যায় ?

নয়নার উষ্ণ আলিঙ্গনে আমি অস্বস্তি বোধ করছি। মাথার মধ্য দিয়ে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল পা পর্যন্ত। নিজেকে বড় অসহায় মনে হল আমার। ওর মুখ দু'হাতের মধ্যে ধরে বললাম, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু···

আমার উষ্ণ নিশ্বাস ওর মুখে পড়তেই বাহুবন্ধন আলগা করে ছুটে গেল শিলার পাশে। ভগীরথ-শিলার ওপর মাথা নুইয়ে বসে পড়ল।

আমি অপলক তাকিয়ে থাকলাম জ্যোৎস্নালোকিত ভাগীরথীর নির্জন তীরে অবলুণ্ঠিতা অনিন্দিতা নারীর আবছায়া মূর্তির দিকে।

শান্ত-স্নিগ্ধ নিঃসীম-নির্জন দেবলোকে এ মুহূর্তে নয়নার যে মূর্তি দেখলাম, তাকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না।

কতক্ষণ নয়না বৌদি যে ভগীরথ-শিলার ওপর প্রার্থনার ভঙ্গীতে পড়েছিল তার হিসেব রাখিনি। যখন ওকে তুলে আনলাম তখন দেখি দু'চোখের কোলে অফুরন্ত অশ্রুর স্পষ্ট স্বাক্ষর।

পরদিন সকাল থেকেই নয়না বৌদি আর সরকার মশাইকে নিয়ে ঘুরলাম সাধুদের আড্ডায়। বিখ্যাত সাধু-সন্তের দর্শন হল। আশীর্বাদও পেলাম অনেকের।

পরিচয় হল পর্বতারোহী ও সন্ন্যাসী স্বামী সুন্দরানন্দের সঙ্গে। গঙ্গোত্রী অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই উনি ভ্রমণ করেছেন। তাই নন্দনবনের জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে নিলাম ওঁর কাছ থেকে।

বিকেলে সাধু-সন্তের আকর্ষণে সরকার মশাই আর নয়না বৌদি

আখড়ায় আখড়ায় ঘুরে বেড়াল। আমি অভিযানের মালবাহক সংগ্রহের কাজে গাইডকে নিয়ে ঘুরে বেড়ালাম সারাদিন।

সন্ধ্যায় সাধুদের আখড়া থেকে ধর্মশালায় ফিরেই নয়না বৌদি আমায় জিজ্ঞেস করল, গোমুখী কত দূর ?

বার-তের মাইল হবে।

যেতে পারব ?

পথ কঠিন, কষ্ট হবে।

পারব কিনা বল না ?

না পারার কিছু নেই।

আমি গোমুখী যাব তোমার সঙ্গে।

গোমুখীতে দেখার তো কিছু নেই। মন্দির-টন্দিরও নেই। বললাম।

গোমুখী তো আছে। তাই দেখতে যাব। কষ্ট করে গঙ্গোত্রী এলাম। গোমুখী না দেখলে তীর্থের ফল পাব না।

সরকার মশায়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, মিছিমিছি কষ্ট করার মানে হয় না। আপনি কি বলেন দাদা ?

সরকার মশাই অমায়িক হেসে বললেন, আমি কে ভাই ? বিবির যখন ইচ্ছে তখন মিঞার মতের দাম কোথায় ভায়া ?

গোমুখী বারো হাজার ফুটের ওপর, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। আপনাদের জামা-কাপড় যা আছে তাতে ওই ঠাণ্ডা সামলাতে পারবেন না।

নয়না বৌদি বাধা দিয়ে বলল, মাতাজী বলেছেন, একটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে যাওয়া যায়। আমরা কম্বল জড়িয়ে গোমুখী যাব।

তা না হয় হল, কিন্তু রাত কাটাতে হবে তো।

ভূজবাসায় লালবাবার আশ্রমে বিছানা পাওয়া যায়। ওখানেই থাকব।

বুঝলাম মাতাজী অর্থাৎ কৃষ্ণাভারতী নয়না বৌদিকে গোমুখী যাত্রার সবকিছুই বলেছেন।

কৃষ্ণাভারতী গঙ্গোত্রী অঞ্চলে মাতাজী নামে প্রসিদ্ধ। উচ্চ শিক্ষিতা এই সন্ন্যাসিনী বাঙালী এবং শুনেছি সন্ন্যাসপূর্ব জীবনে কলকাতার এক নামী বনেদী অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। হিমালয়ের নানা অঞ্চলে উনি তীর্থ পরিক্রমা করেছেন। বর্তমানে গঙ্গোত্রীতে বসবাস করে সাধন-ভজন করেন। ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় প্রায় দশ বছর আগে এক পর্বত অভিযান কালে। সে সময় গঙ্গোত্রী থেকে দলের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য মালবাহক মারফৎ উনি মূলশিবিরে পাঠিয়ে সাহায্য করেছিলেন। মুণ্ডিত মস্তক, নগ্ন পদ এবং অতি সামান্য বেশ-বাসে মাতাজী কৃষ্ণাভারতী স্নেহময়ী এক মাতৃমূর্তি। যে মূর্তির কাছে এসে দাঁড়ালে আপনি মাথা নত হয়ে যায়—হৃদয়ের গভীর থেকে মা ডাক স্বতঃস্ফূরিত হয়।

নয়না বৌদি আর সরকার মশাই আমার সঙ্গী হলেন। গোমুখী যাওয়ার পথে আর বাধা দিতে পারলাম না।

আগামীকাল সকালেই যাত্রা করতে হবে। এ-কারণে পথের প্রয়োজনীয় মালপত্র খাদ্য ইত্যাদি কেনাকাটা সেরে নিতে রাত হয়ে গেল। সরকার মশাই আর নয়না বৌদি খাদি প্রতিষ্ঠান থেকে দুটো ভাল কম্বল কিনে নিল গায়ে দেবার জন্য। আমার জন্যও একটা দিতে চেয়েছিল ওরা, নিইনি। পর্বতারোহণের পোষাক থাকায় কম্বলের প্রয়োজন ছিল না।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর মালপত্র গুছিয়ে বাইরে এলাম। দশ হাজার ফুট উঁচু গঙ্গোত্রীতে তখন গভীর রাত। আধো চাঁদের মিষ্টি আলোয় আধো আলো আধো অন্ধকার। আকাশভরা নক্ষত্র থাকলেও চাঁদের আলোয় ম্রিয়মান। পাহাড়-পর্বত অরণ্য মন্দির ধর্মশালা ছত্র সবই ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে। জেগে আছে কেবল কলস্বিনী ভাগীরথী গঙ্গার উত্তাল স্রোতধারা।

পুব আকাশ রাঙিয়ে সোনালী সূর্য উঠেছে।

সূর্যের রঙ-বেরঙের রশ্মি ঘসা কাঁচের মতো আকাশের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত রাঙিয়ে দিয়েছে। সামনে দিগন্তজোড়া আকাশের পটভূমিতে সারিসারি হিমঢাকা পর্বতশ্রেণী। সূর্যের আলো তুষারাবৃত সেই পর্বতশ্রেণীর ওপর আলতোভাবে রঙের তুলি বুলিয়ে দিয়েছে যেন।

প্রভাত সূর্যকে বরণ করবার জন্য ঘুমন্ত গঙ্গোত্রী জেগে উঠেছে।

শাঁখ-কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে মন্দিরে আশ্রমে।

সাধু-সন্ত ভক্ত তীর্থযাত্রীরা হিমগলা ভাগীরথীর পুণ্য সলিলে অবগাহন করে সূর্য বন্দনা করছে।

আমরা বেরিয়ে পড়লাম ধর্মশালা থেকে।

চলেছি গোমুখী দর্শনে।

গোমুখী থেকে আমাকে আরো এগিয়ে যেতে হবে নন্দনবনের পথে। নন্দনবনে অভিযানের সাময়িক মূল শিবির স্থাপন করতে হবে। তারপর আবার আমাকে ফিরে আসতে হবে গোমুখী। সেখান থেকে দলের অন্য সদস্যদের নিয়ে যাব নন্দনবন। অস্থায়ী মূল শিবির স্থাপন করে এগিয়ে যাব চতুরঙ্গী হিমবাহ ধরে। শ্বেতা হিমবাহ পার হয়ে প্রবেশ করব কালিন্দী হিমবাহে। তারপর যেখানে গঙ্গোত্রী আর বদরীনারায়ণ হিমালয় অঞ্চলের জলবিভাজিকা, যেখানে নীল দিগন্ত এক ঝাঁক সাদা পর্বতের মাথায় হেলে পড়েছে, সেখানে অগ্রবর্তী শিবির স্থাপন করে গঙ্গোত্রীর গর্ব যুগল মানা পর্বতের সঙ্গে মোলাকাত করব।

দলের সদস্যরা এখনো এসে পৌঁছয়নি। আসবে দু'তিন দিনের মধ্যে। ইতিমধ্যে নয়না বৌদিকে গোমুখী দর্শন করিয়ে ফেরত পাঠাতে পারব গঙ্গোত্রী। তাই রাজি হয়েছি।

কথা আছে গোমুখী দেখে সরকার মশাই আর নয়না বৌদি আমাদের এক কুলির সঙ্গে ফিরে আসবে গঙ্গোত্রী। গাইডকে নিয়ে আমি এগিয়ে যাব নন্দনবনের পথে।

পথে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, কনকনে হাওয়া বইছে। সরকার মশাই আর নয়না বৌদি মাথা থেকে কম্বলমুড়ি দিয়েছে। তবু ওরা কাঁপছে। কিছু রাজস্থানের দেহাতি মানুষ মোটঘাটা মাথায় নিয়ে চলেছে আমাদের আগে পিছে। ওরা মাঝে মাঝেই 'গঙ্গামাঈ কী জয়' ধ্বনি দিচ্ছে। জানিনা শীতের কামড় থেকে বাঁচার জন্য গঙ্গামায়ীর জয়ধ্বনি কি-না!

পাহাড়ের গায়ে সংকীর্ণ পথ এঁকে বেঁকে চলেছে। পথের পাশে গুহা-আশ্রম। গুহায় প্রাচীন-নবীন সন্ন্যাসীরা পরমার্থ সাধনায় মগ্ন। কোনো কোনো গুহার বাইরে সাধুর পরিচিতি দেওয়া সাইনবোর্ড। বিজ্ঞাপন দেবার কারণ কি বুঝি না। পরমার্থ কামনায় গহন গিরি কন্দরে এসেও প্রচার করার সাধ গেল না! এরচেয়ে বুঝি মানুষের মধ্যে সমাজে থাকাই শ্রেয়—তাতে অন্তত দু'বেলা দু'মুঠো জুটে যাবে। শীতের কষ্ট ভোগ করে ঈশ্বর সাধনা করতে হবে না। দেহাতি রাজস্থানীরা প্রতিটি গুহার মুখে দাঁড়াচ্ছে। সাধু দর্শন করে প্রণামী দিচ্ছে। নয়না বৌদিও কয়েক জায়গায় প্রণামী দিল।

আঁকাবাঁকা চড়াই পথ একসময় শেষ হল। শুরু হল এবড়ো-খেবড়ো পাথরঢালা পথ। এখানে পথ বলতে কিছুই বোঝা যায় না। গাইডের সঙ্গে যেতে হয়। প্রথমে গাইড তারপর সরকার মশাই এবং শেষে নয়না বৌদি আর আমি। পাথরের ওপর সাবধানে পা রেখে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। এ জায়গায় নদী প্রায় কাছেই। ভাগীরথী চলেছে এঁকেবেঁকে আমাদের পাশে পাশে ডান দিকে। নদীর এপার অরণ্যসংকুল। চীর পাইন আর রডোডেনড্রনের গভীর অরণ্য। অরণ্যের মধ্য দিয়ে পথ পাওয়া যাবে চীরবাসার কাছাকাছি।

সরকার মশাই মাঝে মাঝেই পাথরে পা হড়কে আছাড় খাচ্ছেন। কখনো গাইড আবার কখনো আমি ছুটে গিয়ে তুলছি। নয়না বৌদি আছাড় খায়নি একবারও। সরকার মশাইকে পড়ে যেতে দেখে নয়না বৌদি হাততালি দিয়ে ওঠে। সরকার মশাই কৃত্রিম রাগ দেখান।

বলেন, ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে। পড়লে হাততালি দেওয়ার মজা বুঝতে পারবে।

নয়না বৌদির সাবলীল চলার ভঙ্গী দেখে অবাক হলাম। মনেই হয়না পাহাড়ী পথে এই প্রথম এসেছে। আমার পায়ে পা মিলিয়ে পাথর ডিঙোচ্ছে।

পাথুরে পথ থেকে আমরা উঠে এলাম একটা গিরিশিরার গায়ে। নতুন তৈরি হয়েছে পথটা। এখান থেকে সোজা চীরবাসা পর্যন্ত পথ বেশ ভালই, কেবল মাঝে পড়বে গিলা পাহাড়ের কয়েক ফার্লং পথ। এখানে গিরিশিরার কিছু অংশ নরম মাটি আর আলগা পাথর দিয়ে তৈরি। এই গিলা পাহাড়ের অংশটুকু পার হওয়া বেশ কষ্টকর এবং বিপদসঙ্কুল।

পি-ডবলু ডি'র তৈরি নতুন পথে চড়াই-উৎরাই নেই বললেই হয়। পাহাড়ের গায়ে বড় বড় গাছ আর ফুলের চারা। চারিদিকে নানা বর্ণের ফুল ফুটে আছে। বন্য ফুলের একটা উগ্র বুনো গন্ধ বাতাস ভারি করে রেখেছে।

নয়না বৌদি প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ। বার বার প্রশ্ন করে, এটা কি গাছ, এটা কোন ফুল। এ ফুলে গন্ধ নেই কেন ইত্যাদি। আমি উদ্ভিদবিদ্যায় পারদর্শী নই তাই এটা-সেটা বলে চালিয়ে দিই। চেনার মধ্যে রডোডেনড্রন বৃক্ষ এবং কয়েক প্রকারের পপিফুল চিনি। আর চিনি ব্রহ্মকমল, ফেনকমল আর যুগপদ্ম। এদের সাক্ষাৎ পেয়েছি হিমালয়ের নানা প্রান্তে অভিযান করার সময়।

ব্রহ্মকমলের নাম শুনে উৎফুল্ল নয়না বৌদি। আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, ব্রহ্মকমল ফুল দেখছি না তো?

হেসে বললাম, ব্রহ্মকমল এখানে ফোটে না। তবে তপোবন এবং নন্দনবনে পাওয়া যেতে পারে। ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্সে ব্রহ্মকমল ফেনকমল ফোটে প্রচুর পরিমাণে।

ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স কোথায়?

বদরীনারায়ণ যাওয়ার পথে পড়ে।

এখান থেকে যাওয়া যায় না ?

গঙ্গোত্রী থেকে বাসে যোশীমঠ হয়ে গোবিন্দঘাট চটিতে নামতে হবে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে নন্দনকাননে যেতে হয়।

তুমি যাবে নন্দনকানন ?

এবার তো হবে না।

নয়না বৌদি কেমন যেন মুষড়ে পড়ল।

পাশে পাশে চলছে বটে, কিন্তু মন ওর কোথায় চলে গেছে যেন। কি যে এত ভাবে বুঝি না।

কি ভাবছ নয়না ?

তুমি যে পথে যাচ্ছ সে পথে ব্রহ্মকমল পাওয়া যায় ?

শুনেছি তপোবনে আর নন্দনবনে পাওয়া যায় এই ফুল। গঙ্গোত্রীর পাণ্ডারা এবং সাধু-সন্ন্যাসীরা মা গঙ্গার পুজোর জন্য ওসব অঞ্চল থেকে ব্রহ্মকমল নিয়ে আসেন।

গোমুখী থেকে নন্দনবন কত দূরে ?

মাইল ছয়-সাত হবে। তবে বড় কঠিন পথ। হিমবাহের পাথরের রাজ্য পার হতে ছয়-সাত মাইল দূরত্ব সময় লাগে দশ-বারো ঘণ্টার মতো।

সবাই পারে যেতে ?

সবাই পারে কি-না জানিনা। তবে যারা হিমালয়ের দুর্গম পথে যাতায়াত করেছে তারাই যায় নন্দনবনে তপোবনে।

নয়না বৌদি আমার গা ঘেঁসে অন্তরঙ্গ ভাবে কনুইয়ের মধ্যে নিজের কনুই জড়িয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, আমি পারব ?

মনে মনে এই আশংকাই করছিলাম। ব্রহ্মকমল দেখার বাসনা ওর জেদ হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। হঠাৎ ব্রহ্মকমল নিয়ে পড়ল কেন কে জানে।

আমায় নীরব দেখে নয়না কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে বলে, এই বল না ? পারব যেতে নন্দনবন ?

নয়না বৌদির চলার ধরণ আর জেদ দেখে মনে হয় হয়ত পারবে যেতে। কিন্তু ওই দুর্গম পথে যেখানে মৃত্যু তার থাবা বাড়িয়ে অপেক্ষা করে আছে প্রতিমুহূর্তে, সেখানে স্ত্রীলোক সঙ্গে নেওয়া উচিত নয়। যাত্রার প্রারম্ভে 'পথি নারী বিবর্জিতা' এই আপ্তবাক্য স্মরণে না রাখার জন্য এখন আফশোস হচ্ছে। ওকে যদি বলি পারবে না তাহলে পারার শেষ চেষ্টা করবে। পারবে বললে দায়িত্ব আসবে আমারই ওপর। সরকার মশাইকে বলে লাভ নেই। স্ত্রী যা বলবে উনি তাই করবেন। এটা স্ত্রীর প্রতি ভালবাসায় না ভয়ে তা অবশ্য বুঝতে পারি না।

কই বললে না ?

এবার কিছু না বলে আর উপায় নেই। নয়না বৌদি নাছোড়বান্দা।

অসম্ভব না হলেও সত্যি খুব কঠিন।

কেন ?

কোনো পথ নেই নন্দনবনের।

তাহলে কি তুমি উড়ে যাচ্ছ ?

হেসে ফেললাম। বললাম, বড় বড় পাথর আর মৃত্যু-গহ্বর পার হতে হবে। প্রতি পদে বিপদে পড়ার আশংকা। তোমার দায়িত্ব আমি নিতে পারব না।

নয়না বৌদি আমার কথায় হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেল। ভারী গলায় বলল, তোমায় কে নিতে বলেছে আমার দায়িত্ব ? তাছাড়া নিজের পায়ে যখন যাব তখন দায়িত্বটাও থাকবে নিজের।

খুব লজ্জিত হলাম নয়না বৌদির কথায়। নরম গলায় বললাম, আমি ঠিক ও কথা বলতে চাইনি নয়না। আসলে তোমাকে নিয়ে বিপদসঙ্কুল পথে আমি যেতে চাই না। আমার কাঁদার কেউ নেই এক মা ছাড়া। কিন্তু তোমার ?···

নয়না অপলক তাকিয়ে আছে আমার মুখে। ওর চোখ দুটি বেদনার আদ্র।

তোমাদের গোমুখী যাওয়ার বিরুদ্ধে ছিলাম। জবরদস্তি তোমরা যাচ্ছ। গোমুখীর ওপর আর তোমাদের যাওয়া উচিত নয়।

নয়না মুখ খুলল এবার। বলল, তুমি বললে তোমার মা ছাড়া আর কেউ কাঁদার নেই, তাই না? আর একজন কাঁদার মতো মানুষ আছে তুমি জেনে রেখ।

হালকা সুরে বললাম, সইবে না আমার।

নয়না গভীর ভাবে আবার বলল, তোমার জন্য কাঁদার মানুষ আছে কিন্তু আমার জন্য কেউ নেই।

ওটা তোমার বিলাস।

নয়না বলল, বিলাস নয় বিশ্বাস কর।

কেন, সরকার মশাই?

গম্ভীর হয়ে গেল নয়না বৌদি। খানিক চুপ করে থেকে বলল, ওই একটা মানুষের জন্য যা ভাবনা। আমাদের সব কথা তো তোমায় বলিনি। বলব সব। তবে এ টুকু জেনে রেখো ওই একটা মানুষ ছাড়া এ জগতে আমার আপন বলতে আছ কেবল তুমি।

আমি স্তব্ধ!

নয়না বৌদিদের ঘর-সংসারের কোনো কিছুই আমার জানা নেই। জানার কৌতূহল প্রকাশ করিনি। তবু কথায় কথায় যা জেনেছি তা দিয়ে একটা পরিবারের শুধু রেখাচিত্রই আঁকা যায়। তার বেশি কিছু নয়।

…সরকার মশাই কলকাতার এক বড়সড় ব্যাবসায়ী। প্রচুর সম্পদের মালিক। বাড়ি আছে, একটা নিজস্ব গাড়িও আছে। ব্যবসার কাজে লাগে। বাড়িতেই ছোটখাট অফিস। জনা দশ-বারো কাজ করে সেখানে।

নয়না বৌদির কোনো সন্তানাদি হয়নি। হবে বলে আর মনে হয় না। এ যেমন আমার বিশ্বাস—এ বিশ্বাস বোধ হয় ওদেরও।

নয়না সরকার মশাই-এর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। আগের পক্ষের স্ত্রীর সম্বন্ধে কিছুই জানি না। সে পক্ষের বোধ হয় কোনো সন্তানাদি নেই। থাকলে অন্তত সরকার মশাই-এর মতো পেট আলগা মানুষ বলতেন এত দিনে। এর বেশি জানা উচিত নয়। আর তাছাড়া ওদের পরিবার সম্বন্ধে আমার আগ্রহও নেই জানার। ইচ্ছে করে নয়না বৌদির কথা জানতে। কোথায় যেন একটা বেদনা বুকের সবচেয়ে নরম জায়গায় কাঁটার মতো বিঁধে আছে ওর। সেই বেদনার সঙ্গে বুঝি আমারও কোনো সূক্ষ্ম যোগ রয়েছে। না হলে এত আপন হলাম কেন!···

সাওধান—গিলা পাহাড়—সাওধানসে চলিয়ে···

চমক ভাঙ্গল আমার। এত তাড়াতাড়ি গিলা পাহাড়ের কাছে যে এসে পড়ব ভাবিনি। সাবধান হলাম গাইডের কথায়।

বাঁ দিকের পাহাড় সম্পূর্ণ ধ্বসে পড়েছে। বালির আকার থেকে শুরু করে বিশাল বিশাল পাথর দিয়ে গড়া গিলা পাহাড়। শীতে বরফ জমে হিমবাহ তৈরি হয় এখানে। গরমে বরফ গলে জল হয়ে পাথর আলগা করে দেয়। পাহাড়ে অহরহ ধ্বস নেমে এই অবস্থা। মাঝে মাঝে পাথর ঝুলছে? সরু পায়ে চলার রেখা।

গাইড গিলা পাহাড়ের কঠিন পথ সরকার মশায়ের হাত ধরে পার করাচ্ছে। নয়না চলেছে আমার সামনে। ওর চলার ভঙ্গীটি বড় সুন্দর। অদ্ভুত হাল্কা পায়ে চলতে পারে। তবু ওকে ঝুরো মাটিতে লাঠি চেপে হালকা পায়ে চলতে বললাম। মাঝে মাঝেই টাল খাচ্ছে।

হঠাৎ পায়ের নিচে ঝুরো মাটির খানিক অংশ ধ্বসে গেল। নয়না টাল সামলাতে চেষ্টা করল। আমি ওকে সাহায্য করার জন্য পিছন থেকে ওর কম্বল চেপে ধরতেই আছাড় খেল নয়না বৌদি। হাতের লাঠি গেল ছিটকে। বসে পড়ল ধ্বসা নরম মাটি আর পাথরের ওপর। পায়ের নিচের বিরাট এক চাঙড় মাটি-পাথর খসে পড়ল।

শত চেষ্টায় আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। নয়না বৌদি ধ্বসের সঙ্গে গড়িয়ে পড়ল। আমিও ভারসাম্য হারিয়ে ধ্বসে গড়িয়ে পড়লাম।

ওপর থেকে বহু কণ্ঠের গেল গেল রব একটা বিকট চিৎকারের ঐকতান বলে মনে হল। গাইডের গলা শোনা গেল।—বচনেকো কুরশিস কিজিয়ে সাব। নরম মাটিতে পা ঢুকিয়ে দাও…।

দু'জনেই স্লিপ করে নামছি বালি মাটি পাথরের ওপর দিয়ে নিচে। হাজার দেড় হাজার ফুট নেমেছে ধ্বসটা। হাতের আইস এ্যাক্স দিয়ে পতন রোধ করার চেষ্টা করছি। নরম মাটি-পাথরে পা ঢুকিয়ে দিয়েও পতন রোধ হচ্ছে না। আমার এক হাতে নয়না বৌদির কম্বল অপর হাতে আইস এ্যাক্স। অতল গহ্বরের দিকে নামছি আমরা। এই কি আমাদের কপালের লিখন ?

হঠাৎ কানের পাশ দিয়ে বড় বড় দুটো পাথর কামানের গোলার মতো ছুটে গেল। পাথর গড়ান শুরু হয়েছে। মৃত্যু এবার ঠেকায় কে ? হায়রে, আমার জন্য কাঁদার মানুষটাও আমার সঙ্গে চলেছে। ভাগ্যের কি বিচিত্র পরিহাস !

আইস এ্যাক্স আটকে গেল নরম মতো কাঁকুরে মাটিতে। আচমকা হ্যাঁচকা টানে পতন রোধ হল। তখনো পাথর গড়াচ্ছে তীব্র গতিতে। সাবধানে পা রাখার জায়গা বানালাম। নয়না বৌদিকে তুলে দাঁড় করালাম। ও কাঁপছে থর থর করে। চোখে মৃত্যুর ভয়। ওকে আশ্বাস দিলাম। নয়না বৌদি আমার বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

পা পিছলানো কঠিন পথ কোন যাদুমন্ত্রে পার হলাম জানিনা। কেবল বুঝলাম মৃত্যু নেই এ-যাত্রায় তাই বাঁচলাম। আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার পর মনের জোর বেড়ে গেল শতগুণ।

গভীর অরণ্যে পথ খুঁজে এবার এগোতে হবে। আন্দাজ করে নাকের সিধে উঠতে লাগলাম। নয়না বৌদি আমার দেহলগ্না হয়ে

আছে। ওর আর যেন ওঠার ক্ষমতা নেই। নিজের শারীরিক ক্ষমতাও কমে আসছে। তবু টেনে নিয়ে চলেছি আমার জন্য কাঁদার মানুষটিকে মৃত্যু থেকে জীবনের রাজ্যে।

কতক্ষণ উঠেছি জানিনা। কত পথ হেঁটেছি তারও হিসেব নেই। কাঁটাঝোপ আর গাছের ডালে ঘসা খেয়ে সারাদেহ ক্ষতবিক্ষত। এক সময় দেখলাম আমরা চীরবাসার বিশ্রাম গৃহের সামনে। আমাদের জন্য সরকার মশাই গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

তোমরা চোট খাওনি তো ? কি ভাবনা হয়েছিল যে···

জবাব দেবার মতো ক্ষমতা নেই। বুকের নিচে নিঃশ্বাস ঘন হয়ে গেছে। একটা তীব্র যন্ত্রণার অনুভূতি। পা দুটো পাথরের মতো ভারী লাগছে। শরীরে এতটুকু বল নেই। নয়না বৌদি মৃতপ্রায়। ওকে বিশ্রাম গৃহের চৌকির ওপর শুইয়ে দিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে শুয়ে পড়লাম। অবসাদে ক্লান্তিতে আমার চোখ দুটাও ঘুমে ঢুলে পড়ল।

চীরবাসা থেকে পরদিন সকালে যাত্রা করলাম ভূজবাসায়। পথ মাত্র মাইল চারেক কিন্তু উচ্চতা আর অক্সিজেনের স্বল্পতায় বেশ কষ্টকর। গভীর অরণ্যের আলোছায়ায় পাথর বাঁধানো আঁকাবাঁকা পথ। গাছে গাছে নানা জাতের পাখির কিচিরমিচির। অসংখ্য গন্ধ-হীন ফুলের সমারোহ চারদিকে। এমন আরণ্যক পথে চুপচাপ চলতে ভালই লাগে।

আজ চারজনই চলেছি এক সাথে। আগে সরকার মশাই তারপর নয়না বৌদি শেষে আমি আর গাইড। সরকার মশাই একটানা সাইরেন পাখির মতো কথা বলে চলেছেন। আমরা নীরব শ্রোতা।

কয়েকটি বাঁক নেবার পর উদার দিগন্ত উদ্ভাসিত হল। নীল আকাশের কোলে সারি সারি তুষারাবৃত পর্বত শৃঙ্গ। কখনো নয়না

বৌদি কখনো সরকার মশাই প্রশ্ন করেন ওটা কোন পর্বত এটা কোন শিখর।

দু' পাশের অনুচ্চ দুটি সুদীর্ঘ গিরিশিরার বুক ভেদ করে অসংখ্য ঝরনা নৃত্যের ভঙ্গীমায় নেমে এসে মিশেছে ভাগীরথী নদীতে। গিরিশিরার বিস্তৃত অঙ্গে সারিবন্দী বৃক্ষের বিপুল সমারোহ।

গোমুখ এখনো দূরে, নজরের বাইরে। গঙ্গোত্রী হিমবাহ হাজার বছর আগে এ-সব অঞ্চল জুড়ে ছিল। তার প্রমাণ নদী যেখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তার চেহারা ইংরাজী ইউ এর মতো। হিমবাহ রোদে জলে গলে গিয়ে সরে গেছে পিছনে। হিমবাহের গলা জলরাশী নিয়েছে তার পরিত্যক্ত স্থান। দুটি গিরিশিরার মধ্যবর্তী গেরুয়া বসনা ভাগীরথী গঙ্গা তীব্র বেগে ধেয়ে চলেছে গঙ্গোত্রীর দিকে।

পথের পাশে বুনো স্ট্রবেরীর ঝোপ। লাল লাল টক স্বাদের ফল ফলে রয়েছে অফুরন্ত। মাঝে মাঝে নয়না বৌদি ফল ছিঁড়ে আনে। ভাগ দেয় আমাদের। মুখে পুরলেই পিপাসার শান্তি হয়।

ভাগীরথী অনেক দূরে সরে ছিল এতক্ষণ। এবার চলেছে পাশে পাশে। ভাগীরথী গঙ্গার গেরুয়া জলরাশির ওপর সূর্যের আলো চমকাচ্ছে।

ভূর্জবৃক্ষ দেখা দিল। মাথা সরু গাছ। গাছের সারা গায়ে খোস উঠে আছে যেন। ভূর্জবৃক্ষের ছালে আগে পুঁথিপত্র লেখা হত। আজ আর তা হয় না আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে। স্মারক চিহ্ন হিসেবে কিছু ভূর্জবৃক্ষের ছাল সংগ্রহ করলাম।

খানিক বাদেই আমরা ভূজবাসায় পৌছলাম। ভূজবাসা নিঃস্ব রিক্ত এক পার্বত্য অঞ্চল। লালবাবার ছত্র ছাড়া কোনো প্রাণীর বসবাস নেই এখানে। পথ থেকে সামান্য ওপরে সমতল একখণ্ড জমিতে টিনের চালা দেওয়া লালবাবার যাত্রী নিবাস। গোমুখীর যাত্রীরা এখানে রাত কাটিয়ে গোমুখী দর্শন করে।

লালবাবার আশ্রমে খানিক বিশ্রাম নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম গোমুখীর দিকে। মালপত্র সবই পড়ে থাকল ওখানে। গোমুখী দর্শন করে আবার ফিরে আসতে হবে এখানে রাত কাটাবার জন্য।

ভূজবাসা থেকে পথ বেশ কঠিন। খানিক প্রায় সমতল পথে চলার পর নেমে এলাম নদীর তীরে। এবার পথ পাথরের ওপর দিয়ে। দু'পাশের গিরিশিরা সরে গেছে অনেক দূরে। নদীর ব্যাপ্তি অনেকটা ছড়িয়েছে। এক হাঁটু জলের কি প্রচণ্ড গতি। এপার থেকে ওপারে যাওয়া যায় না। যাত্রীদের প্রয়োজনও হয় না পারাপার করার।

মসৃণ পাথরের ওপর সন্তর্পণে পা রেখে এগিয়ে চলেছি। সরকার মশাই এক হাতে লাঠি অপর হাতে আমার কাঁধ ধরে আছেন। নয়নার এক হাত ধরেছি অপর হাতে তার লাঠি। যদিও পড়ার ভয় নেই তবু ওরা আমায় প্রায় আঁকড়ে ধরে আছে। গোমুখীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতে করতে ওরা চলেছে সঙ্গে।

গোমুখীর পিছনে তিনটি তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ তিনটি কুমারী কন্যার মতো আকাশে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা ভাগীরথী পর্বত। কিছুটা ডান দিকে স্তম্ভের মতো তুষার শূন্য এক পর্বত দাঁড়িয়ে যার মাথায় কেবল তুষার মুকুট—তার নাম শিবলিঙ্গ। তারও পিছনে কেদারনাথ পর্বত ও ডোম। পাশের গিরিশিরা শতপন্থা, মানাপর্বত ও চন্দ্রপর্বতকে ঢেকে রেখেছে। নন্দনবনের পথে গেলে ওদের অনেকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

—গঙ্গা মাঈ কী জয়……জয় নন্দা ভগবতী……একদল যাত্রী জয়ধ্বনি দিল। আমরা গোমুখী পৌঁছলাম।

নয়না বৌদি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে প্রণাম জানাল দেবী জাহ্নবীর উদ্দেশ্যে। তারপর বলল, গোমুখী কোনটা ?

দেখালাম। হিমবাহ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে বরফের নিচের দিকে মুখের মতো একটা জায়গা থেকে ভাগীরথী তীব্র বেগে বেরিয়ে এসেছে। ওটাই গোমুখী।

নয়না বৌদি গোমুখীর আরো কাছে যাওয়ার জন্য বলতেই মানা করলাম। বললাম, ওখানে হিমবাহ থেকে নিচে পাথর পড়ে। যাওয়া উচিত নয়, বিপদ হতে পারে।

নয়না বলল, এত দূরে এলাম, গঙ্গার জল মাথায় দেব না ? চলো সাবধানে যাই।

সরকার মশাই বললেন, বারণ করছে যখন তখন তোমার না যাওয়াই উচিত। বরং গাইডকে বলো, জল নিয়ে আসবে। ওরা ঘাঁৎ-ঘোঁৎ জানে।

নয়না বৌদির পছন্দ নয় দেখে আমি একটা মগে করে গোমুখীর প্রায় সামনে থেকে ভাগীরথী গঙ্গার জল নিয়ে এলাম। নয়না সবার মাথায় ছড়িয়ে দিল সেই পবিত্র জল তারপর গোমুখীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাল।

বালিয়াড়ির খানিক সমতলে বসেছেন সরকার মশাই। নয়না বৌদিও বসল ওঁর পাশে। আমি রুকস্যাক থেকে বিস্কুট কাজু কিসমিস বার করে দিলাম। ফ্লাসকে ভরে চা আনা হয়েছিল। পরম তৃপ্তিতে খাওয়া পর্ব শেষ হল।

এখন বেলা দ্বিপ্রহর। ফিরতে হবে ভূজবাসায়। ওখানে লালবাবার ছত্রে একটা রাত কাটিয়ে কাল নয়না বৌদিরা ফিরবে গঙ্গোত্রী। আমাকে গোমুখী হয়ে যেতে হবে নন্দনবন। পিছনে আমার অভিযাত্রী বন্ধুরা আসছে। উদ্দেশ্য পর্বতারোহণ। সরকার মশাই আর নয়না বৌদির জন্য আমায় আগে ভাগে আসতে হয়েছে ওপরে।

সরকার মশাই কম্বল মুড়ি দিয়ে বালির ওপরে শুয়ে পড়েছেন। খুবই ক্লান্ত মনে হচ্ছে ওঁকে। নয়না বৌদি গোমুখীর দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

আকাশে মেঘ জমছে। রোদের তেজও কমে আসছে ক্রমে। তুষারপাত হতে পারে। তার আগে আমাদের ভূজবাসায় পৌছনো দরকার।

উঠুন। এবার ফিরতে হবে।

আর একটু বসনা ভায়া। সরকার মশাই শুয়ে শুয়েই বললেন, এমন সুন্দর নির্জন জায়গায় শুলে আর উঠতে ইচ্ছা করে না। বড় ভাল লাগছে।

আকাশের অবস্থা ভালো না। তুষারপাত শুরু হলে মুশকিল হবে।

তাই নাকি? তুষারপাত হবে!

সরকার মশাই তড়াক করে উঠে পড়লেন। ভাল করে কম্বল জড়িয়ে নিয়ে বললেন, নয়না ওঠো। আর দেরি করা ঠিক নয়। তোমার জন্য ও বেচারার কাল নাকাল হয়েছে অনেক। চলো।

নয়না এতক্ষণ ধ্যান করার ভঙ্গীমায় বসেছিল বালুকারাশীর ওপর। নিস্পলক তাকিয়ে ছিল গঙ্গার উত্তাল স্রোতধারার দিকে। সরকার মশাই-এর কথায় তার ধ্যান ভাঙ্গল। চোখ ভরা জল টল টল করছে। শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল নয়না। বলল, চলো।

গোমুখীকে প্রণাম করে ফিরে চললাম।

উৎরাই পথ পেয়ে অথবা তীর্থের ফলে খুশি হয়ে কি-না জানিনা, সরকার মশাই প্রায় ছুটে ছুটে চলেছেন আগে। নয়না বৌদির গতিবেগ গেছে কমে। ওর যেন চলার আর ক্ষমতা নেই।

নয়না, কষ্ট হচ্ছে?

না।

একটু পা চালিয়ে চলো। আকাশের অবস্থা খারাপ।

ব্রহ্মকমল দেখা হল না। খেদ ঝরে পড়ল নয়না বৌদির গলায়।

কেন? মন্দিরে দেখলে তো পরশু।

একটা ফুল পেলে ভাল হত।

কি হবে?

মাতাজী বলেছেন, ব্রহ্মকমল ঘরে থাকলে মঙ্গল হয়। তাছাড়া ওই ফুল নিয়ে প্রার্থনা করলে হারানো মানুষ ফিরে আসে।

অবাক হচ্ছি নয়নার এই একটি কথায়।

অনেক বার হারিয়ে যাওয়া কোনো মানুষের কথা বলেছে। পরিস্কার কিছু বলেনি। তাই ওর কে হারিয়ে গেছে জানি না, তবে হারিয়ে যাওয়া সেই মানুষের জন্যে ও ভগীরথের মতো কঠিন তপস্যা করতেও প্রস্তুত যেন।

নয়না বৌদি আর আমি চলেছি পাশাপাশি। কোন এক গোপন ব্যথার ভার বুকে চেপে শ্লথ গতিতে চলেছে ও। ওর কিসের ব্যথা তা জানার এক অদম্য কৌতূহল পেয়ে বসল আমায়। যা কখনো করিনি তাই করে বসলাম। আর আমার সেই কৌতূহল যে অমন একটি কাহিনীর শ্রোতা হবে তা ভাবতেই পারিনি।

নয়না বৌদির হাত নিজের হাতের মুঠোয় আলতো করে চেপে ধরে বললাম, যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমায় বলতে পার তোমার হারিয়ে যাওয়া মানুষের কথা। হয়ত তোমায় সাহায্য করতে পারি।

নয়না বৌদি থমকে দাঁড়াল। ওর চোখ-ভরা টলটলে জল। বর্ষার ভরা পুকুরের মতো টইটম্বুর। আর একটু চলকালেই বুঝি উপচে পড়বে।

ওর চোখ দুটি আমার চোখে আটকে রইল অনেকক্ষণ। নয়না বৌদির বুকের ব্যথা অনুভব করলাম নিজের বুকে। হাতে আলতো চাপ দিয়ে বললাম, থাক তোমার কষ্ট হচ্ছে।

শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিয়ে ম্লান হাসল। তারপর উদ্‌গত বেদনার এক গভীর শ্বাস চেপে বলল, কষ্ট হলেও তোমায় বলব আজ সব।

নয়না বৌদি ধীর পায়ে চলতে চলতে যে কাহিনী শোনাল তার সংক্ষিপ্ত রূপও কম মর্মস্পর্শী নয়।

·১৯৫০ সাল।

দেশ ভাগ হয়েছে তিন-চার বছর। বাইরে পরিবর্তন বোঝা না গেলেও ভেতরে ভেতরে বদলের হাওয়া লেগেছে। মানুষের মনের অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে দেশ ভাগের ফলে। যারা এত দিন সমীহ করত তারা নাক উঁচিয়ে চলে। তাতে অবশ্য নয়নাদের কিছু আসে যায় নি। লোকমুখে শহরের বহু কথা ভেসে আসে। অনেকেই নাকি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ওদের গ্রামের কেউ তখনো বাপ-দাদার ভিটে মাটি ছাড়েনি।

নয়নারা দু'ভাই-বোন। মা-বাবাকে নিয়ে মোট চারজনের ছোট্ট সুখী সংসার। বাবা গ্রামের ইস্কুলের মাষ্টার। তিরিশ-চল্লিশ বিঘে জমির প্রায় অর্ধেকের বেশিতে চাষবাস হয়। চাষের আয়ে সারা বছর চলে যায়। ইস্কুলের নগদ আয় জমার ঘরে পড়ে।

হঠাৎ খবর ছড়াল সরকার জমি কেড়ে নিচ্ছে। কাউকেই বাজার দরে দাম দিচ্ছে না। জমি যারা চাষ করে তাদের মধ্যে বিলি করা হচ্ছে। চাষীরা বেশীর ভাগই সাধাসিধে। তাই এতদিন কোনো গোল বাঁধেনি। শহর থেকে এক নেতা এসে চাষীদের বুঝিয়ে দিয়ে গেছে তাদের অধিকার। চাষীরাও একজোট হয়ে মতলব ভাঁজছে।

এমন সময় ঢাকায় দাঙ্গার খবর এলো গ্রামে। যার যা অস্ত্র মরচে ধরে ছিল তাতে শান পড়ল। সন্দেহের বিষে জর্জরিত সবাই। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না।

নয়নার বাবা গ্রামের মৌলভীর বন্ধু। দাঙ্গা গ্রামে ঢুকে পড়ার আগেই জমিজমা জলের দরে বেচে দিয়ে কেবল ভিটে মাটিটুকু রেখে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়াল স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে। মৌলভী মশাই ওদের হাত ধরে সীমান্ত পার করিয়ে দিল।

নৌকা-স্টিমার এবং শেষে রেলে চেপে হাজার হাজার মানুষের সহযাত্রী হয়ে এক অলুক্ষণে সন্ধ্যায় শিয়ালদার চোখ ধাঁধানো স্টেশান চত্বরে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন নয়নার বাবা। সবার প্রাণ নিয়ে যে শেষ পর্যন্ত এপার বাংলায় আসতে পেরেছেন তাই কত না।

জীবনে কখনো দেশের বাইরে আসেন নি। এ শহরের কিছুই জানতেন না তিনি। অনেকের মতোই শিয়ালদা স্টেশনে আস্তানা পাতলেন সাময়িক ভাবে।

দু'দিন বিশ্রাম নিয়ে বেরোলেন আশ্রয়ের সন্ধানে। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে ঠাসা শহর। সবাই ব্যস্ত। কেউ কাউকে চেনে না। অসহায় ভাবে ঘুরে শেষে ফিরে এলেন। চোখ ধাঁধানো বড় বড় বাড়ি থাকলেও এ শহর বড় নির্দয় বড় স্বার্থপর। উদ্বাস্তুকে কেউই আশ্রয় দিতে চায় না। পয়সা না থাকলে এ শহর অভ্যর্থনা করে না কাউকে।

অস্থায়ী আস্তানার প্রতিটি মানুষের এই একই অভিজ্ঞতা। যাদের এ শহরে কেউ পরিচিত আছে তারা অনায়াসে জনারণ্যে মিশে যেতে পারল। যাদের কিছু সম্পদ ছিল তারা তো জবর অভ্যর্থনা পেল।

দিন যায়, অভিজ্ঞতা বাড়ে।

শিয়ালদার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেল নয়নারা। দেশ থেকে সামান্য যা কিছু আনতে পেরেছিল তা নিঃশেষ হল যথা সময়ে। পেটের দায়ে ইস্কুল মাষ্টার হলেন শিয়ালদা স্টেশনের আন-অথরাইজড্ কুলি।

সে সব দিনের কথা নয়নার ছবির মতো স্মৃতি হয়ে আছে। তখন কতই বা বয়েস ওর। মাত্র আট বছর। দাদার বয়েস বারো। ও বয়সে স্মৃতি সবার সমান হয় না। নয়নার মনে আছে কারণ সে জীবন গ্রামের স্থির শান্ত জীবনের চেয়েও গতিময় আর চমকপ্রদ ছিল বলে।

বাবার অনিয়মিত রোজগারে চারজনের পথের জীবনও চলে না এ শহরে। তাই বাবার দোসর হয়ে দাদা নিরুপমও কুলির কাজ করতে লাগল। যাত্রীদের ছোটখাট স্যুটকেস বা বিছানা মাথায় করে পৌঁছে দেয়। সারাদিন খেটে যা পায় মায়ের হাতে তুলে দেয়।

নয়না ঘোরে বৈঠকখানা বাজারে। শাক-পাতা আর পচাধসা আলু কুমড়ো পটল বেগুন কুড়িয়ে আনে আঁচলে করে। এ কাজটার ধান্দা অবশ্য দাদা দিয়েছিল। অস্থায়ী আস্তানার অনেকেই এ কাজ করত। নয়না অবশ্য বাবার চোখের আড়ালেই বাজারে যেত। বাবা কখনোই মাকে অথবা ওকে আস্তানার বাইরে যেতে দিতেন না। বনেদী ঘরের বৌ-ঝির মান-ইজ্জত থাকে না বাজারে ঘুরলে।

সুখ দুঃখের পথের জীবন চলছিল এ ভাবেই।

একদিন সকালে দাদা নিরুপম রোজগারের ধান্দায় বেরিয়ে আর ফিরল না। বাবা অস্থির হয়ে খুঁজলেন ক'দিন। কোথাও পাওয়া গেল না নিরুপমকে। প্রতিবেশীরা বলল, থানায় খবর করতে। বাবা ছুটলেন থানায়। কেউই পাত্তা দিল না। ছিন্নমূল একটা উদ্বাস্তুর হারিয়ে যাওয়া সন্তানের জন্য কারই বা মাথা ব্যথা হবে? কেউ কেউ বলল, ভালই হল। সমর্থ ছেলের ভার সে নিজেই নিয়েছে। খাওয়ার পেট তো কমল একটা। আশ্চর্য, বাবা কেমন করে যেন শোক গিলে নিলেন। কাজে নেমে পড়লেন। মা প্রথম দিকে কেঁদেছিল খুব। বাবাকে উত্যক্ত করেছিল ছেলের খোঁজ করার জন্য। তারপর মা কেমন যেন হয়ে গেছে। একটা উদাসী ভাব। হাসে না, কাঁদে না, কথা বলে না। নয়নাকে আর বাজারে যেতে দেয় না একলা।

মা-বাবার শোক স্তিমিত হলেও নয়নার চোখের জল ফুরোয় নি। নয়না একাকী বসে বসে কাঁদে। দাদাটাই ছিল ওর বন্ধু খেলার সাথী প্রাণ সবকিছু। খেলা নিয়ে খাওয়া নিয়ে কত ঝগড়া করেছে। হারিয়ে যাবার আগের দিন রাতেও মায়ের পাশে শোয়া নিয়ে ঝগড়া করেছে দাদার সঙ্গে। আজ আর ঝগড়া করার কেউ নেই। মায়ের কোলের কাছে শোয়ার জন্য কেউ মানা করবে না তাকে। ভাইটা যে কোথায় গেল তা ভাবার মতো বোঝার মতো মনও ওর তৈরি হয়নি তখনো। কেবল একটা অভাববোধ একটা শূন্যতা ওকে ম্রিয়মান করে রাখে।

স্টেশনে রাস্তায় বাজারে নিরুপমের বয়সী ছেলে দেখলেই থমকে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, কোথায় বাড়ি, কি নাম। তারপর জিজ্ঞেস করে, তার দাদা নিরুপমকে দেখেছে কি-না।

দাদার খোঁজ-খবর করা প্রায় নিয়মিত অভ্যাসের ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেল। নিরুপমের বয়সী ছেলে ছাড়াও অন্য লোকজনকে জিজ্ঞেস করে তার দাদাকে দেখেছে কি-না।

সরলা কিশোরী এ শহরের কিই বা জানে, কতটুকুই বা চেনে। শহরের পাপ তো তার জানার কথা নয়। ভাবে বুঝি গ্রামের মতোই সব মানুষ তার ভাইকে চেনে। কেউ না কেউ তার হদিশ দেবেই একদিন। আর এ আশায় মা-বাবাকে এড়িয়ে নিয়মিত ঘোরে বাজারে পথে স্টেশনের আশপাশে।

একদিন স্টেশন চত্বরের বাইরে ফলের দোকানের কাছে কালো চশমা পরা ফিটফাট এক অবাঙ্গালী লোককে নিরুপমের কথা জিজ্ঞেস করে বসল। লোকটি মিটিমিটি হেসে বলল, চেনে নিরুপমকে। নয়না চাইলে দাদার কাছে ও নিয়ে যেতে পারে।

নয়না এক কথায় রাজী হয়ে গেল।

শহরের পাপ ওকে স্পর্শ করল সহজেই। লোকটির সঙ্গে সরল বিশ্বাসে ট্যাকসিতে চেপে বসল। তারপর কেমন করে যেন অচেনা এক দেশে এসে পড়ল ও। ট্যাকসীর লোকটা ওকে ট্রেনে তুলে দিয়ে সেই যে গেল আর তার দেখা পায় নি কোনো দিন।

তারপর অনেক হাত বদল হয়ে অজানা এক শহরের মধ্য-যৌবনা এক সহৃদয়া নারীর আশ্রয়ে এসে উঠল নয়না। মহিলার কাছে আসার আগে ওকে বলা হয়েছিল নিরুপম এখানেই আছে। এখানেই তার সঙ্গে দেখা হবে।

দিনের পর দিন দাদার অপেক্ষায় চোখের জল ফেলেছে নয়না। শেষে বুঝেছে সব মিথ্যে। আসলে ঐ বাড়ির মালিক তার দাদার

নামটাই শুনেছে, দেখেনি কখনো। এতদিন ওরা ওকে মিথ্যে স্তোক দিয়েছে।

সুদীর্ঘ ছুটি বছর যে কোথায় দিয়ে কেমন করে কেটে গেল কে-জানে। এ সময় মহিলার কাছে শিখল নাচ আর গান। এ ছুটিই প্রিয় ওর। তাই আগ্রহ নিয়ে শিখল মহিলার কাছে। মহিলাও দরদ ঢেলে শেখাল নয়নাকে।

বয়স যখন তেরো ছাড়িয়ে চোদ্দয় পা দিতে চলেছে তখন নয়নার রূপ যৌবনের প্রথম স্পর্শে সবে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। ভিতরে ভিতরে অজস্র ভাঙ্গাচোরা চলছে। দেহের নানা প্রান্তে বিচিত্র ঢেউ দেখে কখনো বুঝতে পারে কি যেন একটা হচ্ছে—আবার অনেক কিছু বোঝে না কখনো। মনের নিভৃতে আনন্দানুভূতির শিহরণ। বিচিত্র এক আনন্দময় জগতে ও যেন বিচরণ করে একাকী। প্রতিটি নাচের ভঙ্গী প্রতিটি গানের কলির মধ্যে অপূর্ব অনাস্বাদিত এক আনন্দ পায়। আর সেই আনন্দের সাগরে মজে থাকে নয়না সর্বক্ষণ।

এ বাড়ি সারাদিন ঘুমোয়, রাতে জেগে থাকে। সূর্য ডোবার আগেই ঘর দোর থেকে মানুষজন সবাই সাজগোজ করে তৈরি হয়ে নেয়। নয়না দেখে। রাতের আঁধার ঘন হলেই বড় বড় গাড়ি এসে দাঁড়ায় দরজায়। তারপর বাড়ির বড় হল ঘরে বসে গানের মজলিস। গান আর নাচ। অবাঙ্গালী মহিলা রতনবাঈ তখন ধূপ আর অগুরুর গন্ধে ভারী ঘরের বাতাসে ঠুংরীর সুর ভাসিয়ে দিয়ে ইন্দ্রজাল রচনা করে। নাচগান চলে মাঝরাত পর্যন্ত। কখন শেষ হয় তা জানে না নয়না। মজলিস শেষ হবার আগেই নিজের ঘরে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে ও।

মজলিসের ঘরে কি হয় তা দেখার প্রচণ্ড আগ্রহ ওর। কিন্তু রতনবাঈয়ের নিষেধে ওমুখো হতে পারে না।

যৌবনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মজলিসের ঘরে ডাক পড়ল নয়নার। যে শিক্ষা পেয়েছে রতনবাঈয়ের কাছে তার পরীক্ষা দিতে

হবে। সন্ধ্যায় রতনবাঈ নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছে নয়নাকে। তারপর নিজেই বিস্মিত মুগ্ধ হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছে, ইস, তোকে হিংসে করতে ইচ্ছে হচ্ছেরে নয়না। বাবুদের মাথা তুই ঘুরিয়ে দিবি দেখছি।

নয়না লজ্জা পেয়েছে রতনবাঈয়ের কথায়। বুকের নিচে কৌতূহলের সঙ্গে ভয়ও উঁকি দিয়েছে।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে নয়না।

নাচে গানে মাতিয়ে দিয়েছে মজলিস। শ্রোতাদের মধ্যে অল্প বয়েসী এক সুদর্শন যুবক তো নাচের পর হীরে বসান হার ওর গলায় পরিয়ে দিয়েছে। যুবকটির মুখ দেখে বুঝেছে ও পরীক্ষায় পাশ করেছে।

মজলিসের পর রতনবাঈ ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদরে ভরিয়ে দিয়ে বলেছে, তুই আমার সব কেড়ে নিয়েছিস।

নয়না গভীর আবেগে বলেছে, তুমি দিয়েছ, তাই তো পেলাম।

রতনবাঈ ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে রেখে বলেছে, আমার সব তোকে দিয়ে তোর মধ্যেই বেঁচে থাকব নয়না।

নয়নার দু'চোখ বেয়ে জল ঝরেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছে মা বাবা দাদার কথা। তারা থাকলে কত আনন্দ পেত। কোথায় যে তারা আছে কে জানে? রতনবাঈকে বলেছে দাদা আর মা-বাবার কথা।

রতনবাঈ গম্ভীর হয়ে গেছে। বলেছে, সময় হলেই তাদের কাছে তোকে পাঠানো হবে।

আনন্দ আর সীমাহীন প্রাচুর্যের মধ্যে দিনগুলো সোনা হয়ে ওঠে। শরীরের কষ্ট হবে বলে রতনবাঈ নিয়মিত মজলিসে নাচগান করতে দেয়না নয়নাকে। মাঝে মাঝে কোনো রইস আদমি এলেই তবে ডাক পড়ে ওর। মনপ্রাণ ঢেলে নাচে গান গায় নয়না। বোঝে না কেন এই ধনী মানুষগুলো এলে ওর ডাক পড়ে।

প্রতিদিন ভোরে বাড়ির ছাদে গিয়ে দাঁড়ায় নয়না। বাড়ির বাইরে বের হবার আইন নেই। সদর দরজায় সব সময় লোক থাকে। দরকারও হয় না ওর বাইরে যাবার। অচেনা শহরতলী—যদি আবার হারিয়ে যায়, এই ভয়। এ তবু একটা আশ্রয়ে আছে। রতনবাঈ মায়ের মতোই স্নেহময়ী। সংসারের কোনো আঁচই লাগতে দেয় না ওর গায়ে। নয়না রতনবাঈকে ভালবাসে।

ছাদে দাঁড়িয়ে নীল আকাশের ব্যাপ্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগে নয়নার। দিগন্তের কোলে কালচে ঢেউ খেলানো গিরিশ্রেণী। শহরতলী আর পাহাড়ের মধ্যে উদাস খাঁ-খাঁ মাঠ। তার ওপর দিয়ে সমান্তরাল রেল লাইন। বাড়ির সামনের বড় রাস্তাটা সোজা রেল স্টেশনে চলে গেছে। এখান থেকে স্টেশনটা দেখা না গেলেও সিগন্যাল পোষ্ট নজরে পড়ে। এ পথ কি শিয়ালদায় গেছে—জানে না নয়না।

শিয়ালদার কথা মনে পড়লেই দাদার মুখ ভেসে ওঠে চোখের সামনে। শৈশব কৈশোরের সে সব স্মৃতি বড় মধুর বড় বেদনার। দাদার খোঁজে নয়নাও শেষে উধাও হল। মা-বাবা কি অবস্থায় আছে? বাবা কি এখনো যাত্রীদের মালপত্র বইছে? মা কি এখনো স্টেশন চত্বরে মাটির হাঁড়িতে চালডাল ফুটিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করছে? মা-বাবা কেমন আছে?

মন ভার হয়ে ওঠে নয়নার। দূর দিগন্তের কোলে হেলান দিয়ে থাকা কালো পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে যায়। চোখের কোণ থেকে মুক্তোর মতো জলের ফোঁটা ঝরে ওর গোলাপী গাল বেয়ে।

৬

একদিন গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। কার যেন চড়া গলা বাজছে পাশের ঘরে। ও-ঘরে রতনবাঈ থাকে।

পুরুষকণ্ঠ বলে, আর অপেক্ষা করব না। অনেক টাকা গলে গেছে। এবার সেই টাকাটা তুলতে হবে।

রতনবাঈয়ের গলা, আর অন্তত একটা বছর অপেক্ষা করো। সবে চোদ্দ চলছে। এ বয়সে ও শরীরের মর্ম বুঝবে না। একবার কাল সাপে ছোবল দিলে আমার সব শিক্ষা বরবাদ হয়ে যাবে।

তাতে আমার কিছু যাবে আসবে না। এত দাম যদি পরে কেউ না দেয় তাহলে বেকুফ বনে যাব।

আমি বলছি, তুমি আরো বেশি পাবে। ওকে অন্তত দেহের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই।

সে তো এক দু' দিনের ব্যাপার। তার জন্যে এক বছর লাগবে কেন? পুরুষকণ্ঠ উত্তেজিত।

রতনবাঈ শান্ত হয়ে বলে, তোমরা বুঝবে না। আমার কাছে যখন এনেছ তখন আমায় বিশ্বাস করতে পার। শরীরের ছলা কলা শিখলেই দেখবে ওর দাম চড়বে।

অন্ধকারে বিছানায় উঠে বসল নয়না। ওকে নিয়েই যে পাশের ঘরে আলোচনা চলছে তা বুঝতে অসুবিধে হল না।

পুরুষকণ্ঠ সমান উত্তেজনা গলায় ধরে বলল, না, এক বছর আমি অপেক্ষা করতে রাজী নই। তোমায় এক মাস সময় দিলাম। এর মধ্যে ওকে সব শিখিয়ে দাও। যদি রাজী থাক তাহলে প্রিন্সকে পাঠাতে পারি। এ ব্যাপারে ওর দরাজ দিল। মোটা টাকা পাবে।

রতনবাঈ ঝাঁঝিয়ে উঠল। নয়না আমার পেটের মেয়ে না হলেও তার চেয়ে কম কিছু নয়। আমার মেয়েকে তুমি নষ্ট করেছ। ওকে আমি প্রাণ থাকতেও নষ্ট হতে দেব না। আমার সাধনার সব কিছু ওকে আমি উজাড় করে দিয়েছি। ওর মধ্যেই আমি বেঁচে থাকব।

পুরুষকণ্ঠ রাতের বাতাস কাঁপিয়ে হা-হা-হা করে হেসে উঠল। বলল, আমিও তাই চাই। তবে সময় এক মাস। সামনের মাসে ওকে ছাড়তেই হবে। অনেক টাকা এ্যাড্‌ভান্স নিয়ে বসে আছি।

খানিক স্তব্ধতা। তারপর পুরুষকণ্ঠ আবার বেজে উঠল, আজ চলি। দেখো যেন চিড়িয়া উড়ে না যায়।

নয়না ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ এক সময় নিচে মিলিয়ে গেল। কিন্তু সদর দরজা বন্ধ হবার শব্দ এলো না। দারোয়ান নিশ্চয় জেগে বসে আছে। নাহলে, এতক্ষণ দরজা বন্ধ করার আওয়াজ শুনতে পেত।

পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পরই খুট করে হাল্কা নীলাভ আলো জ্বলে উঠল। নয়না অনুভব করল রতনবাঈ ওর বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। খানিক বাদে মাথার চুলে সস্নেহে হাত বুলিয়ে কপালে আলতো করে একটা চুমু খেয়ে আলো নিভিয়ে চলে গেল। নয়নার চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল।

রাতটা কাটল ভয়ে ভাবনায় কাঁটা হয়ে। ওকে নিয়ে লোকটা কি করতে চায়? যা শুনেছে তাতে মনে হয় কোনো রইস আদমির কাছে ওকে বিক্রি করে দেবে। অনেক টাকা অগ্রিম নিয়েছে। যার কাছে ওকে বিক্রি করবে সে লোকটা কেমন? কোথায় নিয়ে যাবে ওকে? প্রিন্স কে? তাকে কেন আনতে চায় লোকটা? কিছুই বুঝতে পারে না। তবে আসন্ন একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে এটুকু বুঝেছে। যে বিপদের নায়িকা নয়না নিজে।

ছোটবেলায় শুনেছে ছেলেধরারা ছেলে মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয়। একদল লোক নাকি সেই সব ছেলে মেয়েদের পঙ্গু করে ভিক্ষে করায়। আশংকায় কেঁপে উঠল নয়না। ওকেও কি পঙ্গু করে ভিক্ষে করাবে? আবার ভাবে, তাই যদি হয় তা হলে রতনবাঈ এত নাচ-গান শেখাচ্ছে কেন? এখন কি করবে নয়না! চোখ থেকে ঘুম চলে গেল।

সারারাত ভেবে ঠিক করল ভোর হলেই পালাবে এখান থেকে। অচেনা এ-শহরের কিছুই না চিনলেও রেল স্টেশনটা ওর চেনা। এ-বাড়ি থেকে সোজা রাস্তা। ভোরবেলায় একটা ট্রেন আসতে দেখেছে প্রায়ই। কোথায় যায় ট্রেনটা জানে না নয়না। যেখানেই যাক না কেন, ওই ট্রেনে উঠেই পালাতে হবে।

ভোরবেলায় এ-বাড়ি গভীর ঘুমে ডুবে থাকে। এ-বাড়ির মানুষ গভীর রাত পর্যন্ত নাচ-গান বাজনা নিয়ে মেতে থাকার পর যখন ঘুমোয় তখন ভোরের আলো ফোটে। নয়নাকেও অনেক রাত এমনভাবেই নাচতে হয়েছে তারপর ঘুমিয়েছে বেলা পর্যন্ত।

ভোরের আবছা আলো জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকতেই নয়না উঠে পড়ল। হাতের আঙুল দিয়ে চটপট অবিন্যস্ত চুলগুলো ঠিক করে নিল। সাদামাটা একটা কাপড় জড়িয়ে নিয়ে সন্তর্পণে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। নিস্তব্ধ নিঝুম পুরী। কারো সাড়াশব্দ নেই। সবাই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

পা টিপে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে দেখল নিচের দরজা ভেজানো রয়েছে। কোনো পাহারাদার নেই। বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। ক্ষণেকের তরে রতনবাঈয়ের জন্য মন কেমন করল। মায়ের মতো স্নেহ ওর। ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। আজ তবু নিজেই ছেড়ে পালাচ্ছে, না হলে একদিন ওকে ছেড়ে যেতেই হত।

মন শক্ত করে নেমে পড়ল বড় রাস্তায়। আশে পাশে তাকিয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই। উন্মাদের মতো কখনো হেঁটে কখনো ছুটে চলল স্টেশনের দিকে। রেল স্টেশনে এসে দেখল একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। এ গাড়িটাকেই রোজ এ সময় আসতে দেখে। উঠে বসল নয়না তাতেই। কোথায় গাড়িটা যাবে জানে না। জানার আগ্রহ এ মুহূর্তে ওর নেই। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখি একবার পিঞ্জর মুক্ত হলে কি আর কোথায় যাবে চিন্তা করে। অসীম নীল আকাশের ডাকে সে মুক্তির আনন্দে ডানা মেলে দেয়।

কোথায় চলেছে জানে না নয়না। কি ওর ভবিষ্যৎ তাও অজানার অন্ধকারে। এ গাড়ি কি ওর কৈশোরের পরিচিত শিয়ালদা স্টেশনে নিয়ে যাবে ওকে? যেখানে ওর মা-বাবা হয়ত দাদাও ওর জন্যে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছে। ওরা অপেক্ষা করছে কি? ওরা

শিয়ালদায় এখনো আছে কি ? যদি মা-বাবা-দাদাকে খুঁজে না পায় তাহলে কি করবে নয়না ? কোথায় যাবে ?

ভাবতে ভাবতে হতাশ হয়ে পড়ল। তবে কি ভুল করল নয়না ? হঠাৎ প্রিন্সের মদীর চোখ দুটি মনে পড়ল। শিউরে উঠল। মনে মনে ভাবল দাদার খোঁজে অজানা পথে একদিন যখন পা বাড়িয়েছিল তখন যেমন ভয় হয়নি, আজই বা ভয় পাবে কেন।

বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণের দায়ে ধরা পড়ল নয়না। রেলের কামরা থেকে সোজা জেল হাজত। তারপর জেল হাজত থেকে উদ্ধার আশ্রম। বিনা টিকিটে রেলে চড়ার অপরাধই অবশেষে ওকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। দিয়েছে ভবিষ্যতের আশ্রয়।

কলকাতার উপকণ্ঠের এক নারী উদ্ধার আশ্রমে আশ্রয় পেল নয়না তারপর।

আশ্রমের মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় নয়নার শিক্ষা-দীক্ষা লেখা পড়ার পাঠ শুরু হল। নতুন জীবনের স্বাদ অনুভব করল ও। বিভীষিকাময় অতীত ভুলে বর্তমানের আনন্দময় জীবনে ডুবে গেল নয়না।

মাঝে মাঝেই মা বাবা দাদার কথা মনে পড়ে। কয়েক দিন আশ্রমের মায়ের সঙ্গে শিয়ালদায় এসেছে। আতিপাতি করে শিয়ালদার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত খুঁজেছে মা-বাবাকে। পায়নি তাদের। আশ্চর্য, একজনও পরিচিত মানুষকে দেখেনি ওখানে। খোঁজ নিয়ে জেনেছে, অনেকেই নাকি দণ্ডকারণ্য আর আন্দামান চলে গেছে। জমিজমা পেয়ে ঘর বেঁধেছে সেখানে। আন্দামান বা দণ্ডকারণ্য না গেলেও আশ্রমের তরফে সরকারী পর্যায়ে খোঁজ খবর করা হয়েছে। হদিশ মেলেনি তবু।

যৌবন যখন ভরভরন্ত নয়নার তখন সরকার মশাই ওকে সসম্মানে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ঘরে এনেছেন। এরজন্য আশ্রমের মায়ের কাছে নয়না কৃতজ্ঞ।

বিয়ে হয়েছে আর পাঁচটা বাঙালী ঘরের গেরস্ত মেয়ের মতোই। নয়না যেমনটি চেয়েছে ঠিক তেমনটি। আশ্রমেই মায়ের তত্বাবধানে এবং অন্যান্য সখীপরিবৃত হয়ে বিয়ের সব অনুষ্ঠান হয়েছে। এমন কি সারারাত বাসর জেগেছে সবাই।

পরদিন সরকার মশায়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে মোটরে চড়ে শ্বশুরবাড়ি আসার আগের মুহূর্তে মা বলেছেন, মেয়ের আমার যেন কোনো কষ্ট না হয় বাবা। ওর কেউ না থাকলেও এই মা'টি আছে। কখনো যদি প্রয়োজন হয় আমাকে জানাবেন। ওর মা-বাবা দাদার খোঁজ আমরা করছি, পারলে আপনিও একটু চেষ্টা করবেন, কেমন ?

সরকার মশাই প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে এসেছেন নয়নাকে। সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজের হৃদয়ে।

শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ-দেওর আর আত্মীয়-পরিজনে পরিপূর্ণ সংসার। নয়না প্রথমটা থতিয়ে গেছিল। এত বড় পরিবার কেবল আশ্রমেই দেখেছে। এই বিশাল পরিবারের বড় বউ হওয়ার সম্মানই আলাদা। তার মতো হতভাগ্য মেয়ের কপালে এ-যে রাজ সুখ! ভাবতেই পারেনি নয়না। মনে মনে ভয়—কি জানি এরা কেমন ভাবে নেবে ওকে। উদ্ধার আশ্রমের মেয়ে সম্বন্ধে অনেকের অনেক রকম ভাব আর জিজ্ঞাসার কথা শুনেছে। এরা কি ওকে পুরনো দিনের কথা জিজ্ঞেস করবে ? নয়না তার অতীতের স্মৃতি ভুলতে চায়। কিন্তু এরা কি ওকে ভুলতে দেবে ?

ফুলসজ্জার রাতে সরকার মশায়ের বুকে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে নয়না। বলেছে নিজের জীবনের সব কথা। সরকার মশাই সস্নেহে আদরে ওকে আশ্বাস দিয়েছেন—এ বাড়িতে তার মর্যাদা বড় বউয়ের। অতীত নিয়ে কেউই আগ্রহী নয় এখানে।

নয়না কৃতজ্ঞ শ্বশুরবাড়ির সবার কাছে। সবাই ওকে আপন করে নিয়েছে। সরকার মশায়ের আগের পক্ষের স্ত্রীর ফটো নিজে সযত্নে

সাজিয়ে মালা পরিয়েছে রোজ। আর এর ফলে নয়না কেবল শ্বশুর-শাশুড়ির নয় বাড়ির সবার নয়নের মণি।...

নয়না তার জীবনের সুদীর্ঘ কাহিনী শেষ করে যেন আরো ক্লান্ত হয়ে পড়ল। পা যেন আর ওর চলে না। আমার কাঁধে ভর দিয়ে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে চলল।

গোমুখীর উদার আকাশে রিক্ত এক বেদনার সুর বেজে চলেছে।

নয়নার জীবনের ইতিহাস যেমন বেদনাময় তেমন বৈচিত্র্যে ভরা। এ যেন ছায়াছবির কাহিনীর মতো। মানুষের জীবন যে কোনো উপন্যাসের কাহিনীর চেয়েও মহৎ এবং রোমাঞ্চকর। নয়নার জীবনের কথা শুনে আমার সেই উক্তি মনে পড়ছে বার বার।

কৈশোরে অনেক কিছু হারিয়েছে যেমন, যৌবনে তেমন অনেক কিছু পেয়েছে। তবে এমন বেদনা কেন ওর মনে? নিজের মুখে বলেছে, 'এমন শ্বশুরবাড়ি আর এমন সদাশিব স্বামী পাওয়া ভাগ্য। এদিক দিয়ে সত্যি আমি ভাগ্যবতী। আমি সুখী।' জানি না, এই সুখী মেয়েটিকে কোন দুঃখ এমন ম্রিয়মান করে রেখেছে!

নয়নার ছেলেপুলে হয়নি। এদিক দিয়ে ও নিঃস্ব। এটা একটা মস্ত দুঃখ হতে পারে। কিন্তু ওকে কখনো সে দুঃখের কথা বলতে শুনিনি। নিজের জীবনের এত গোপন কথা যে মেয়ে নিঃসঙ্কোচে বলতে পারল সে ভুলেও কিন্তু সন্তান নেই বলে খেদ প্রকাশ করেনি। আমার মতো একজন অবিবাহিত পুরুষের কাছে ও-কথা বলতে বেধেছে হয়ত। এটাই স্বাভাবিক।

ওর একটা দুঃখ স্পষ্ট তাহল হারিয়ে যাওয়া বাবা-মা আর দাদা। এতদিনে তাদের খোঁজ কিছু পেয়েছে কি-না কে জানে? এখনো বলেনি। হয়ত খোঁজ পায়নি বলে বলেনি।

নয়না ঘন ঘন শ্বাস টানছে। হাঁপাচ্ছে। ওর চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হল। ক্রমেই ওর দেহের ভার আমার কাঁধের ওপর পড়ছে।

থামলাম। জিজ্ঞেস করলাম, একটু বসবে ?

না, চলো এগিয়ে যাই ধীরে ধীরে।

একটু বিশ্রাম নিলে পারতে। অনেকটা পথ একটানা হেঁটে তোমার কষ্ট হচ্ছে। হাঁপাচ্ছ। একটু বসলে ভাল হত।

বসলে আর উঠতে পারব না। তার চেয়ে ধীরে ধীরে হাঁটা ভাল।

নয়না বৌদি বসল না। কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিয়ে চলতে লাগল ধীরে ধীরে।

দু' জনে পাশাপাশি হাঁটছি নীরবে।

বাঁ দিকে ভাগীরথী গঙ্গা গর্জন করতে করতে চলেছে পাথরের ওপর দিয়ে। নদীর বুকে অসংখ্য ছোটবড় পাথর ছড়ানো। পাথরে আছাড় খেয়ে জলে অসংখ্য ফেনা উঠছে। ধবধবে সাদা ফেনা জলের স্রোতে আবার মিশে একাকার হচ্ছে।

ভাগীরথী গঙ্গা যেন এক উচ্ছল কিশোরী। উদার আকাশের নিচে নানা রঙে হেসে গেয়ে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। অনেকটা যেন কিশোরী নয়নার মতো। যে নাচতে গাইতে জানে।

নদীর সঙ্গে নয়নার সাদৃশ্য মনে পড়ায় মনে মনে অবাক হলাম।

নয়না, আজ একটা গান শোনাবে ?

আমার আচমকা কথায় নয়না বৌদি চমকে উঠল। মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন পড়তে চাইল। ওর চমকানো আমার নজরে পড়েছে। তাই বিব্রত বোধ করলাম। বললাম, এই নিঃসঙ্গ প্রকৃতির মধ্যে বসে আমার গান গাইতে গান শুনতে বড় ভাল লাগে, তোমার অসুবিধে থাকলে বরং থাক।

নয়না আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ফাঁকা মাঠে বসে গান শুনতে তোমার ভাল লাগে ?

লাগে বলেই তো বললাম।

কি গান ভাল লাগে ?

ভাটিয়ালী বা শ্যামাসংগীত। রবীন্দ্র সংগীতও ভাল লাগে।

আশ্চর্য ! নয়না বড় বড় চোখে তাকাল আমার মুখে।

কি আশ্চর্য ?

না, এই গান শোনা আর কি ।

নয়না বৌদি কি যেন বলতে গিয়ে তা চেপে গেল। সঙ্গে গানটাও।

হাঁটছি চুপ চাপ। কারো মুখে কথা নেই।

চারিদিকে অখণ্ড এক নিস্তব্ধতা বাতাস ভারী করে রেখেছে। উপত্যকার মেঘ এসে জমছে চারিদিকে। এমন আকাশে ঝড় ওঠেনা বটে তবে তুষার ঝরে।

নয়নার গতি স্তিমিত হয়ে আসে। অনেকটা পথ। একটু পা চালিয়ে চলা ভাল। তুষার পড়া শুরু হলে মুশকিল হবে। দেখছি কথা বলতে বলতে ভালই হাঁটে নয়না বৌদি। চুপচাপ চলে যখন তখন গতিবেগ কমে যায়।

বললাম, একটু পা চালিয়ে চল। আকাশের অবস্থা খারাপ হচ্ছে ক্রমে। তুষার পড়বে আজ।

আর কতটা পথ বাকি ?

মাইল খানেক হবে।

নয়না বৌদি মাথা নিচু করে হাঁটছে। পাশে পাশে চলেছি আমি।

আচ্ছা নয়না, তোমার সেই ভাই বা মা-বাবার কোনো খোঁজ পেয়েছ ?

নীরবে মাথা নাড়ল নয়না বৌদি। বলল, আজও চেষ্টা করে যাচ্ছি। উনিও চেষ্টা করছেন, খোঁজ করছেন।

কথার পিঠে কথা হারিয়ে গেল। আবার এক শ্বাসরোধ করা স্তব্ধতা নেমে এলো। দু'জনেই খানিক চুপচাপ হাঁটলাম। ভূজবাসার কাছাকাছি চলে এসেছি। অনেকটা পথ হাঁটায় বেশ ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। আকাশে মেঘ থাকায় শীতের কামড়াও বাড়ছে। একটু তাড়াতাড়ি

পা চালাতে পারলে লালবাবার ধর্মশালায় পৌঁছে আগুনের ধারে বসা যেত।

নয়না বলল, নন্দনবন থেকে আমার জন্যে একটা ব্রহ্মকমল এনে দেবে?

বুঝলাম নয়না বৌদি হারিয়ে যাওয়া মা বাবা দাদার খোঁজ পাওয়ার আশায় ব্রহ্মকমল আনতে বলছে আমায়। জানি না পাহাড়ী ফুল ব্রহ্মকমলের এত গুণ আছে কি না। কিন্তু ওর বিশ্বাসে আঘাত করতে মন চাইল না। বললাম, পেলে তোমার জন্য নিশ্চয় আনব।

ঝিরঝির করে তুষার পড়া শুরু হল। বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। আকাশের রঙ ঘষা কাচের মতো। দূরের পাহাড়ের মাথায় ঘন মেঘ নেমে এসেছে।

হঠাৎ নয়না বসল একটা পাথরের ওপর।

এখানে বসছ! ওঠো। তুষার পড়ছে দেখছ না?

নয়না শিশুর মতই হেসে বলল, সেই জন্যেই তো বসলাম।

ওকে দেখে আর মনেই হয়না খানিক আগে বাবা-মা দাদার ভাবনায় হারিয়ে গেছিল।

কম্বল ভিজে গেলে শীতে কষ্ট হবে।

হোক। তুষার পড়া তো আর দেখতে পাব না।

লালবাবার ধর্মশালায় বসে দেখতে পাবে।

সেখানে তো আর তুষারে ভিজতে পাব না।

নয়না বৌদি হঠাৎ আমার হাত ধরে টেনে পাশে বসিয়ে বলল, বস না। একা একা কি এমন সুন্দর দৃশ্য দেখতে ভাল লাগে?

নয়না আমার হাতটা ওর কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে হাতে উত্তাপ ছড়িয়ে দিতে দিতে বলল, জান, ছোটবেলায় দেশের ধূ-ধূ মাঠে আমি আর দাদা এমন ভাবেই বিষ্টিতে ভিজতাম গান গাইতাম। গাইতাম আমাদের দেশের ভাটিয়ালী গান। সবাই জানে ও গান। আমি গান ধরলে দাদা আমার সঙ্গে গলা মেলাত। দাদা শ্যামা

সংগীতই বেশি ভালবাসত। রবীন্দ্র সংগীতও প্রিয় ছিল ওর। কিন্তু রবীন্দ্র সংগীত তখন এত জনপ্রিয় ছিল না প্রচারের অভাবে। আমি আবার শ্যামা সংগীত মোটেই গাইতে পারতাম না। বৃষ্টি ভিজে গান আর টক আম নুন দিয়ে খেতে কি ভাল যে লাগত না কি বলব তোমায়। তারপর বৃষ্টিতে ভিজে জাব হয়ে ঘরে ফিরলে মায়ের হাতে মার খাওয়াটাও ভাল লাগত। মা মারতে পারত না জোরে। মায়ের মার খেয়ে আমরা আড়ালে হাসতাম।

নয়না ওর শৈশবের মধুর দিনগুলোর অনেক গল্প করে গেল। আমি নীরব শ্রোতা হয়ে শুনলাম।

ঝর ঝর করে তুলোর মতো নরম তুষার ঝড়ে পড়ছে। পথ প্রান্তর নদী আর পাহাড় সবই সাদায় সাদা হয়ে গেছে।

হিমালয় প্রকৃতি কেমন যেন শান্ত নীরব। কোথাও কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই। অথচ আকাশে বাতাসে তুষারে অদৃশ্য প্রাণের নিয়মিত স্পন্দন নীরব প্রকৃতিকে মুখর করে রেখেছে।

তুষার মেখে আমরাও সাদা হয়ে গেছি। বাতাস নেই তাই উন্মুক্ত প্রান্তরে তুষার মেখে বসে থাকতে পারছি। বাতাস বইলে তা কয়েক কিলোমিটার বেগ পাবে। তখন আর এমন অনাবৃত উন্মুক্ত প্রকৃতির নিচে বসে থাকা যাবে না। হাওয়ার কনকনে ঠাণ্ডা কামড় দেহের অনুপরমানুতে হিম পরশ বুলিয়ে দেবে। দেহে নামবে রাজ্যের ঘুম। আর সেই ঘুম কালনিদ্রার দোসর।

এখুনি নিশ্চিত আশ্রয়ে ফিরে যাওয়া উচিত। বিশেষ করে নয়না বৌদির জন্য ভাবনা আমার। মানসিক এই অবস্থায় ওর অতি উচ্চতা জনিত কোনো রোগ যদি হয় তার দায় তো আমার বটেই, ফলে অভিযানেরও ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। কয়েকবার বলেছি ভূজবাসায় গিয়ে বিশ্রাম নেবার কথা, শোনেনি। আকাশের অবস্থা দেখে শংকিত হয়েও ওর ইচ্ছার কাছে হার মানতে হয়েছে আমায়।

তুলোর আঁশের মতো তুষার ঝরছে একটানা। নয়না বৌদি

আমার কাঁধে মাথা রেখে ভাগীরথীর তুষারমাখা জলস্রোতের দিকে আনমনে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে। ওর হৃৎস্পন্দন আমি শুনতে পাচ্ছি—শুনতে পাচ্ছি ওর হৃদয়ের ভাষা।

ভোরের আলো ফুটছে ভূজবাসার আশ্রমে।

এবার বিদায়ের পালা।

আমরা বেরিয়ে এলাম মালপত্র নিয়ে।

আশ্রম থেকে বেরিয়ে সরকার মশাই গাইডকে বললেন নয়নাকে যেন সাবধানে নিয়ে আসে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, চলি ভায়া। উত্তরের অপেক্ষা না করেই উনি দ্রুতপায়ে গঙ্গোত্রীর দিকে যাত্রা করলেন। ওঁর এমন ভাবে চলে যাওয়াটা আমার যেন কেমন লাগল। এটা কি বিচ্ছেদ এড়ানোর জন্যে নাকি গতকালের তুষার ভেজার কারণে। গতকাল ওঁকে কিছুটা অসন্তুষ্ট হতে দেখেছি।

নয়না বৌদি দূরের পর্বতশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে আছে। ওকে আজ বড় বিমনা দেখাচ্ছে। কাল বিকেলে তুষার ভেজার সময়ে যে আনন্দ আর উত্তেজনা দেখেছি, এখন তার লেশমাত্র নেই। হল কি ওর? স্বামী-স্ত্রীতে কোনো বিবাদ হয় নি তো!

নয়না, এবার আমায় বিদায় দাও। অনেকটা পথ যেতে হবে।

নয়না বৌদি আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, দুর্গা, দুর্গা। শুভ যাত্রার সময় বিদায় চাইতে আছে? বল আসছি।

নয়নার চোখ দুটো লালচে। হয়তো কাল রাত্রে ওর ঘুম ভাল হয়নি। পথে আজ আবার সেই কঠিন গিলা পাহাড় পার হতে হবে ওকে। গাইডকে বার বার বলে দিয়েছি দুজনকে সাবধানে পার করে দেয় যেন। গিলা পাহাড় পার করিয়ে গাইড ওদের মালবাহকের হেপাজতে দিয়ে ফিরে আসবে গোমুখীতে। তারপর আমরা যাত্রা করব নন্দনবন। ওদের সঙ্গে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত গেলে ভাল হত। কিন্তু

উপায় নেই। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। আজই আমায় পৌঁছতে হবে নন্দনবনে।

নয়না, আমি আসছি। তোমার জন্যে একটা ব্রহ্মকমল যেমন করে পারি আনব নন্দনবন থেকে।

নয়না হঠাৎ সকচিত হল। ছোট্ট হাতঝোলা থেকে শুকনো একটা ব্রহ্মকমল বার করে আমার মাথায় ঠেকিয়ে বুক পকেট গুঁজে দিয়ে বলল, লালবাবা ফুলটা দিলেন সকালে। এটা তোমার সঙ্গে থাক। পথে বিপদ আপদ হবে না।

কিন্তু তোমার দাদা মা বাবার জন্যেই এটা পেয়েছ, আমাকে আবার···

নয়না আমার বুকে হঠাৎ মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠল। বলল, তোমার মঙ্গলের জন্যেই ওটা আমি নিয়েছি স্বামীজীর কাছ থেকে।

আমি বিস্ময়ে বিমূঢ়!

গোমুখ থেকে গঙ্গোত্রী হিমবাহের পাথরের রাজ্য অতিক্রম করে রক্তবরন হিমবাহকে বাম দিকে রেখে নন্দনবনে এসে পৌঁচেছি।

সুবিস্তৃত সবুজ সমতল নন্দনবন। বছরে মাত্র চার-পাঁচ মাস তুষার মুক্ত থাকে। পনেরো হাজার ফুটের ওপর এর উচ্চতা। বরফ গলে গেলেই গজিয়ে ওঠে সবুজ ঘাস। ঘাসের কার্পেট পাতা নন্দনবনের সবুজ সমতলে তির তির করে বয়ে যায় সরু সরু রূপোলী জলের নালা। এ সময় ঘাসের ফাঁক দিয়ে সরু সরু ফুলের চারাগাছ মাথা ঠেলে ওঠে। তারপর একদিন ফুটে বের হয় রঙ-বেরঙের ফুল। ছোট ছোট ফুল। সারা সবুজ অঙ্গনে ফুলের মেলা বসে। শীতের শুরুতে শুকিয়ে ঝরে যায় মরসুমী ফুল সবার অলক্ষ্যে। সবুজ ঘাস রোদে জ্বলে পুড়ে কালচে। রঙিন প্রজাপতি আর পাখির দল যারা ফুলের লোভে ঘর বাঁধে নন্দন-বনে, তারা এসময় কোথায় যেন চলে যায়। শীতকে ওরাও সমীহ

করে। তারপর আট মাস গভীর তুষারের নিচে স্বয়ং নন্দনবনও ঘুমিয়ে থাকে একাকী।

নন্দনবনে এসে ব্রহ্মকমলের সন্ধান করেছি। পাইনি কোথাও। গাইডের কাছে শুনেছি তপোবনে হয়ত পাওয়া যেতে পারে। তপোবন নন্দবনের ঠিক উল্টো দিকে গঙ্গোত্রী হিমবাহের ওপরে। ওদিকে আমরা যাব না। মনটা খারাপ হয়ে গেল। একটা ফুল নয়না বৌদির জন্য আমায় যোগাড় করতেই হবে।

নিজের হারিয়ে যাওয়া মা বাবা দাদার সন্ধান পাবার আশায় একটি ব্রহ্মকমল সংগ্রহ করার জন্য যে দুর্গম নন্দনবনে আসতে চেয়েছিল, সেই মানুষ ভূজবাসায় সাধুর কাছে দুর্লভ ব্রহ্মকমল পেয়েও আমার কল্যাণের জন্য, মঙ্গলের জন্য তা আমাকেই দিয়ে গেল! বিচিত্র মেয়েদের মন—যার হদিশ পাওয়া ভার।

নন্দনবনে অভিযাত্রীবন্ধুরা সবাই একত্রিত হয়েছি। মালপত্র নিয়ে চতুরঙ্গী হিমবাহ ধরে এগিয়ে গেছি হিমালয়ের গভীরে। চতুরঙ্গী শ্বেতা আরো কত কত অনামী হিমবাহ আর তুষার প্রান্তর অতিক্রম করে শেষে কালিন্দী হিমবাহের বুকে চেপে বসেছি। এখান থেকেই পর্বতারোহণের সংগ্রাম শুরু হয়েছে আমাদের।

একদিন একান্ত একাকী দূরে আকাঙ্খিত পর্বত শিখরের দিকে তাকিয়ে বসে আছি। আমার চারিদিকে কালিন্দী হিমবাহের সীমাহীন তুষার অঙ্গন আর আকাশছোঁয়া পর্বতশৃঙ্গের প্রাচীর। দলের ক'টি অভিযাত্রী বন্ধু ওপরের শিবির থেকে সংগ্রাম করছে। অধরাকে ধরার কঠিন সংকল্প তাদের। এমন সময় হঠাৎ-ই অভিযান-নিয়োজিত ডাকহরকরা ডাকের বোঝা সংবাদের বোঝা নিয়ে এসে উপস্থিত। আমার নিঃসঙ্গতার অভিশাপ মুছে গেল।

রানার এক গাদা চিঠি আর সংবাদপত্র এনেছে গঙ্গোত্রী থেকে। নিঃসঙ্গ পাহাড়ে-পর্বতে পরিচিতজনের চিঠি পেতে বড় ভাল লাগে। মুহূর্তে তাদের নিকট সান্নিধ্য অনুভব করি।

মাথায় ওঠাটা আমার ভাল লাগে না। বরফে পা পিছলালে—মাগো, ভাবতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। গিলা পাহাড়ের কথা মনে পড়ছে। না ভাই, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। আর তোমায় পাহাড়-পর্বতে যেতে দেবো না।

কবে ফিরছ কলকাতায়? চিঠি পাওয়া মাত্র উত্তর দেবে। তোমার ভগ্নীপতিকে নিয়ে হাওড়ায় থাকব। তোমার আসার অপেক্ষায় রইলাম। আমার প্রণাম নিও। ইতি—

তোমার আদরের বোন
নয়না

নয়নার চিঠি পড়ে চোখ ঝাপসা হয়ে গেল আমার। হিমালয়ের পথে অনেক দেখেছি অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে, কিন্তু এমন অভিজ্ঞতা এমন চমক যে আমার জন্যে অপেক্ষা করেছিল তা জানতাম না।

চশমার কাচ পুঁছে আবার চিঠির দিকে দৃষ্টি ফেরালাম। থমকালাম। পুনশ্চঃ শব্দ এবং তারপরের লেখাটা দেখে। আর এক অচেনা হাতের লেখা। নয়নার লেখার সঙ্গে যার মিল নেই। "পুনশ্চ" কে শুরু করল আবার? কে লিখেছে? হাতের লেখাটা পুরুষের, বেশ পাকা। পড়া শুরু করলাম—

পুনশ্চঃ—নয়নার চিঠিতে আমার "পুনশ্চ" তোমাকে আবার বিস্মিত করছে তো? উপায় নেই ভায়া। পরের চিঠি পড়া অপরাধ তা স্ত্রীর হলেও। আমার জীবনে এই প্রথম নয়নার চিঠি পড়লাম তার অসাক্ষাতে। এ অপরাধের ক্ষমা নেই জানি তবু বিশ্বাস করি তুমি ক্ষমা করবে আমায়। তুমি পুরুষ—বুঝবে আমার কথা।

তোমার সঙ্গী হয়ে গঙ্গোত্রী-গোমুখ ভ্রমণ করার সময় মনে কোনো সন্দেহ বা ভয় হয়নি আমার। তোমার সরল মুখ চোখ দেখেই বুঝেছিলাম ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু গোমুখ থেকে ভুজবাসায় ফিরে তোমাদের ফিরতে দেরি দেখে মনে প্রথমে আশংকা শেষে ভয় হল।

কি জানি, কি হল তোমাদের। গাইড বলল ভয়ের কিছু নেই। তুষার পড়া শুরু হল। ভয়টা বাড়ল। তারপর তোমরা ফিরলে। নয়না তুষার ভেজার বর্ণনা দিল বিশদ ভাবে। মনে কেমন যেন সন্দেহ হল। ওর বলার উৎসাহ দেখে সন্দেহ আর ঈর্ষা আমায় অন্ধ করে দিল। ভাবলাম, কই নয়না তো আমার সঙ্গে তুষার বা বৃষ্টিতে ভিজতে চায় না। পথে-ঘাটে বৃষ্টি নামলেই আশ্রয় খোঁজে। বলে বৃষ্টি ভিজলে শরীর খারাপ করবে। এত উৎসাহ কোন কারণে ?

মনে একবার সন্দেহ দেখা দিলে নানা ঘটনার পরম্পরা যোগসূত্র রচনা করে। তোমাদের আলাদা হয়ে পথ চলা যে আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তা সত্য না হলেও সত্য বলেই মনে হল। তার ওপর তোমাদের বয়সের সমতায় সখ্য যে গাঢ় হবে সেটা স্বাভাবিক ধরে নিয়ে ঈর্ষা বাড়তেই লাগল। নয়নার অতীত আমার জানা—তাই সেই ঈর্ষা ক্রমেই ভয়ে রূপান্তরিত হল। ভূজবাসার রাত আমার অনিদ্রায় আর অস্বস্তিতে কাটল।

পরদিন সকালে তাই তোমার কাছে বিদায় না নিয়েই নয়নাকে গাইডের হেপাজতে রেখে গঙ্গোত্রী চলে এসেছি ঈর্ষায় আর ক্রোধে।

তারপর নয়না ফিরেছে। ওকে আনমনা দেখে তোমার উপর ঈর্ষা বেড়েছে। কিন্তু আশ্চর্য হয়েছি, সেদিন থেকেই নয়না বড় বেশি নির্ভর করা শুরু করেছে আমার ওপর। বিয়ের পর ওকে এমন আপন করে পেয়েছি খুবই কম। ফলে আমার রাগ আশংকা ঈর্ষা দূর হয়েছে। কিন্তু মাঝে মাঝে যখনই তোমার কথা ও বলেছে আমায় সেই মুহূর্তে একটা ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠেছে ভেতরে। প্রকাশ করিনি যদিও। মনের ভয় যায়নি তখনো—নয়নাকে যদি হারাই ?

আজ আর বলতে লজ্জা নেই—নয়না আমার হৃদয়জুড়ে আছে। এই প্রৌঢ় বয়েসে ওকে হারিয়ে আমি বাঁচব না ভাই।

এমন সময় নয়না তোমায় চিঠি লিখল। দেখলাম কি যত্ন কি মমতা নিয়ে সারাদিন ধরে লিখল তোমায়। তারপর বার বার পড়ল

চিঠিটা অনেক রাত পর্যন্ত। আড়চোখে দেখি আমি আর ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরি। সারারাত ঘুমতে পারলাম না। নয়নাকে জিজ্ঞাসাও করতে পারলাম না কি লিখেছে। অথচ নয়না চিঠির কথা তোমার কত কথা কতবার বলল আমায়।

পরদিন সকালে তোমার চিঠি খামে পুরে ঠিকানা লিখে দিল আমায় ডাকে দেবার জন্য। গাড়িতে বসে জীবনের প্রথম অপরাধটা করে বসলাম। নয়নার চিঠি খুলে পড়লাম। পড়ার পর লজ্জায় দুঃখে মাটিতে মিশে গেলাম। ছিঃ ছিঃ, কি সন্দেহ বাতিক মন আমার। নয়নার কাছে তোমার কাছে কি আর মুখ দেখাতে পারব কোনো দিন? সারা রাস্তা ভাবলাম অনেক তারপর ঠিক করলাম নিজের মনের পাপের কথা তোমায় জানিয়ে পাপের ভার কমাব। আর এ কারণেই নয়নার চিঠির নিচে "পুনশ্চের" আবির্ভাব।

ভায়া, তুমিই এখন আমার একমাত্র সম্বন্ধী। এমন প্রিয় সম্পর্ক এতদিন না থাকায় মনে মনে বড় ক্ষুণ্ণ ছিলাম। এখন আর খেদ নেই। এখন আমি পূর্ণ।

ক্ষমা করলে তো ভাই?

বোনটি তোমার বড় উতলা হয়ে অপেক্ষা করছে। হারিয়ে যেও না যেন। নয়না কষ্ট পাবে। আমিও কম কষ্ট পাব না। কারণ তোমার জন্যই নয়নাকে আজ বড় কাছে পেয়েছি। জীবনের বাকী কটা দিন ওকে কাছে পাবার আনন্দ থেকে আর আমায় বঞ্চিত করো না ভাই। পাহাড় থেকে ফিরেই আমার বাড়িতে আসবে—না হলে আমার স্বার্থেই তোমায় ধরে আনতে হবে।

প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ—

বিনয় সরকার

নয়না আর সরকার মশাইয়ের চিঠি পড়ে বিমূঢ় ও হতভম্ভ হয়ে বসে আছি। দূর দিগন্তে শুভ্র পর্বত শিখরের মাথায় জমাট বাঁধা মেঘ

সরে গেছে। চারদিক আলোয় আলো হয়ে গেছে। উজ্জ্বল সে আলোর দিকে চোখ রাখা যায় না।

ভাবছি বসে নয়নাদের কথা। কোথায় ছিল ওরা, পরিচয়ই ছিল না ওদের সঙ্গে। প্রথম দিনের প্রথম দেখার সময় নয়না হাঁ করে তাকিয়ে ছিল আমার মুখে। আমার মধ্যে কি দেখেছিল তা জানতাম না। পরে একাত্ম হয়েছি। নয়না 'বৌদি' সম্পর্ক তুলে দিয়ে বন্ধু হয়েছে। আপনি থেকে তুমিতে নামিয়েছে আমায়। তারপর ও এত কাছে সরে এসেছে যে মাঝে মাঝে নিজের মনে ভয় হয়েছে আমার। ভূজবাসায় বিদায়ের সময় আমার কল্যাণে ব্রহ্মকমল মাথায় ছুঁইয়ে পকেটে ভরে দেওয়ায় যেমন অবাক হয়েছিলাম তেমনি বিব্রত হয়েছি। এখন বুঝতে পারছি এর কারণ। যাতে ওর দাদার মতো আবার হারিয়ে না যাই।

বুক পকেট থেকে শুকনো ব্রহ্মকমলটি বার করে মেলে ধরলাম সামনে। নীলাভ লালচে আভা কমলে নয়নার স্পর্শ অনুভব করলাম। চোখদুটো আবার ঝাপসা হয়ে এলো।

সযত্নে নয়নার দেওয়া ব্রহ্মকমলটি বুক পকেটে তুলে রাখলাম। দুর্গম পথে এটিই আমার রক্ষা-কবচ।

॥ তিন ॥

হিমালয়ের দুর্গম থেকে ফেরার পথে সুযোগ পেলেই ক'দিন বদরীনারায়ণে কাটিয়ে যাই।

ভ্রমণকারীরা যেমন সময় সুযোগ পেলে শহরের উত্তাপ ভিড় আর কোলাহল থেকে মুক্তির নিশ্বাস ফেলার জন্য শৈলশহরে গিয়ে ওঠে—আমারও তেমন দুর্গমপথে হাঁপিয়ে ওঠার পর বদরীনারায়ণে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি।

গত বিশ বছর আসছি। যখনই উত্তর গাড়োয়াল হিমালয়ে ভ্রমণ অথবা অভিযানের কারণে এসেছি তখনই ফেরার পথে দু'চার দিনের জন্য বদরীনারায়ণে বিশ্রাম নিয়ে গেছি।

বদরীনারায়ণ হিমালয়ের দুর্গম তীর্থগুলির অন্যতম। দুটি বিশাল পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ উপত্যকায় বদরীক্ষেত্র। উপত্যকার মধ্য দিয়ে অলকানন্দা নদী বয়ে গেছে।

উপত্যকার এদিকের জমি ঊষর বন্ধ্যা। বুনো ঝোপ আর জুনিপার গাছ ছাড়া আর কিছু জন্মায় না। নদীর ওপারের জমির প্রাণ আছে। চাষবাস হয়।

বদরীনারায়ণ মন্দিরের সামনের বিরাট লোহার পুল দু'পাশের উপত্যকাকে সংযুক্ত করেছে। নীচে বহমান অলকানন্দা নদী। অলকাপুরীর অঙ্গন থেকে বেরিয়ে বদরীনারায়ণের পা ছুঁয়ে নেমে গেছে দেবপ্রয়াগে ভাগীরথী গঙ্গার সঙ্গে মেলার জন্য।

নদীর এপারে নীলকণ্ঠের সানুদেশে বদরীনারায়ণের বিশাল কারুকার্যমণ্ডিত মন্দির খুবই প্রাচীন। ধর্মশালা, পাণ্ডাদের বসতবাড়ি বিশ্রাম ভবন, চটি, দোকানপাট, সবই মন্দির সংলগ্ন। যা কিছু দেখার তা সবই এপারে মন্দিরের আশেপাশে।

নদীর ওপারে যা ছিল বন্ধ্যা জনহীন প্রান্তর, সত্যবর্তমানে যেখানে বহু আশ্রম, বিশ্রাম ভবন, ঘরবাড়ি, দোকানপাট, আধুনিক হোটেল-মোটেল, বাস আড্ডা এবং মিলিটারী ছাউনী গড়ে উঠেছে।

নদীর ওপার দুর্গম বদরীক্ষেত্র কিন্তু এপার আধুনিক শৈল শহর। শহরের সব সুখ স্বাচ্ছন্দ পাওয়া যাবে এপারে। আর এই দু'পারের জীবনকে যা একত্রিত করেছে তা হল অলকানন্দার ওপর লোহার ভারী সেতু।

বিশ বছর আগের বদরীনারায়ণ আর আজকের বদরীনারায়ণে কত তফাৎ। এর চেহারাটাই ছিল আলাদা। বিশ বছর আগে এত ধর্মশালা, দোকানপাট, বিশ্রাম ভবন, হোটেল-মোটেল বিদ্যুৎ সরবরাহ বা বাসপথ ছিল না। তখনকার পথঘাট ছিল আদিম আরণ্যক। তীর্থযাত্রীদের বহু পথ পায়ে হেঁটে আসতে হত বদরী-নারায়ণ। তাই যাত্রীর সংখ্যাও ছিল অত্যন্ত কম।

একজন যাত্রীর জন্য মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে ধর্না দিত পাণ্ডারা। অনেককে দেখেছি হরিদ্বার থেকে যাত্রীদের ধরতে। সারা পথে ছিল অসংখ্য দরিদ্র মানুষ। মেয়েরা শিশুরা একটা পয়সা একটা সূঁচ সুতোর জন্য যাত্রীর পিছনে ছুটত উদয়-অস্ত। সামান্য দানে অসামান্য তৃপ্তি পাওয়া যেত সে সময়।

সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই পালটেছে। অনেক কিছুই হারিয়েছি আমরা। পাণ্ডারা আজও আছে তবে সেকালের মতো নয়। বদরীনারায়ণে বাস থামলে তারা আসেন জাবদা খাতা হাতে। খোঁজ নেন পুরনো যজমানের। হুড়োহুড়ি নেই কাড়াকাড়ি নেই। নেই দরিদ্র ছেলেমেয়েরা যারা 'এক-পাই দে-দো সাব' বলে ছুটত। আসলে প্রতিরক্ষা আর পর্যটন দপ্তর ওদের সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে।

সেকালে হিমালয়ের মানুষের দিন চলত চাষবাস আর পশুচারণ করে। এতে সবার পেট ভরত না। ফলে পয়সার জন্য ভিক্ষে করতেও

বাধত না। এখন ওরা পথ তৈরির কাজ পাচ্ছে। পাচ্ছে ভাল মজুরী। অভাব মিটেছে—সমৃদ্ধি এসেছে হিমালয়ের গহনে।

বদরীনারায়ণের বহু আকর্ষণীয় বস্তুর মধ্যে অলকানন্দা নদীর ওপর বিশ বছর আগের কাঠের পুলটাও আকর্ষণীয়। এটি বর্তমানে লোহার পুলে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রথমবার বদরীনারায়ণে এসে এই পুলটার ওপর দাঁড়িয়ে নিচে অলকানন্দার তীব্র উচ্ছ্বাস দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। অলকানন্দার তীরে ব্রহ্মকুণ্ড এবং ব্রহ্মকপালী। ব্রহ্মকুণ্ড উষ্ণ প্রস্রবণ। কথিত আছে জগতের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এখানে নাকি বারো হাজার বছর ধরে এক নাগাড়ে তপস্যা করেছিলেন একটি পাথরের ওপর। তাঁর দেহ-নিঃসৃত স্বেদবিন্দু থেকে এই উষ্ণ প্রস্রবণের সৃষ্টি। এখানে স্নান করলে সব পাপ ধুয়ে যায়। পাপ ধোয় কি-না জানি না, তবে শরীরের ক্লেদ অবশ্যই ধুয়ে যায় এবং এর সঙ্গে অত্যধিক ঠাণ্ডায় গরমকালে স্নানের আনন্দটা তাৎক্ষণিক লাভ। আর এই লোভেই প্রতিটি যাত্রী স্নান করে এখানে। আমি তো দিনে অন্ততঃ দু'বার পাপ ধুয়ে আসি ব্রহ্মকুণ্ডে!

ব্রহ্মকপালী, সান বাঁধানো ঘাট। ওখানে পিতৃপুরুষের পারলৌকিক ক্রিয়া করা হয়। ওখানে পিণ্ড দিলে আর কোথাও পিণ্ড দিতে হয় না। ব্রহ্মকপালীতে নাকি নিজের পিণ্ড নিজে দান করা যায়। পাণ্ডার কাছে শুনেছি আগে এখানে দেবতারা আসতেন পিতৃপুরুষের পারলৌকিক কাজ করতে। এখন মানুষ দেবত্ব লাভ করে এখানে পিণ্ডদান করছে।

সে যাত্রায় বদরীনারায়ণে তিন দিন ছিলাম। সেই তিন দিনে অন্তত বার ছয়েক পুলের ওপর দাঁড়িয়ে অলকানন্দার স্রোতধারা দেখতাম। অনুভব করার চেষ্টা করতাম দেবতাদের কতটা কাছে আসতে পেরেছি।

প্রথম দিন নজরে পড়ে আমার মতোই এক মহিলা ওখানে অলকানন্দার উচ্ছল গতির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

মহিলা তন্বী যুবতী। ছিপছিপে চেহারা। পরণে ম্যাচ করা শাড়ি আর ব্লাউজ। গায়ে নতুন একটা লাল রঙের শাল জড়ানো। সুন্দর কাশ্মীরী কাজ করা তাতে। গায়ের রঙের সঙ্গে শালের লাল রঙ মিশে অদ্ভুত এক লালিত্য ফুটিয়েছে। এক কথায় চোখে লাগার মতো চেহারা মহিলার।

লক্ষ্য করলাম, মহিলা শুধুই অলকানন্দার শোভা দেখছেন না। পুলের ওপর দিয়ে যাতায়াতকারী প্রতিটি মানুষকে খুঁটিয়ে দেখছেন। আমাকেও বার কয়েক দেখা হয়ে গেছে ওঁর।

ইচ্ছে হচ্ছে মহিলার সঙ্গে আলাপ করি। কিন্তু অপরিচয়ের বাধা আমাকে আটকে রেখেছে। অথচ দু'জনে দু'জনকে দেখছি। এ এক অস্বস্তিকর ব্যাপার।

বিদেশ বিভূঁয়ে অপরিচয়ের বাধা থাকে না বেশিক্ষণ। বিশেষত বাঙালী হলে তো কথাই নেই। আলাপের মুখপাতও কঠিন নয় মোটেই। নিজভূমে অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে সহসা আলাপ করা সহজ নয় সবার পক্ষে। সেখানে প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিকের বেড়া দিয়ে ঘেরা। কি মনে করবে কে জানে—এই ভয় আর সংকোচ। বিদেশে—কোথা থেকে আসছেন? কবে এসেছেন? উঠেছেন কোথায়?—ইত্যাদি দিয়ে সহজেই কথা শুরু করা যায়। অপর পক্ষ আগ্রহী হলে আলাপ জমে ওঠে। আলাপ থেকে শেষে প্রলাপ। দোষ নেই কোনো। একটু আধটু মন দেয়া-নেয়া কিংবা হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় মেলাটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। এমন ভুরি ভুরি অভিজ্ঞতা আমার নিজেরই রয়েছে।

আশ্চর্য, এই মহিলার মধ্যে কি একটা যেন আছে যা আকর্ষণ করে কিন্তু কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

কখন যেন সন্ধ্যা নেমেছে বদরীনারায়ণ উপত্যকায়। মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা শাঁখ বাজার শব্দে সম্বিৎ ফিরল আমার। দেখি মহিলা মাথা থেকে শালটা মুড়ি দিয়ে মন্দিরের দিকে চলেছেন দ্রুত পায়ে।

বাধত না। এখন ওরা পথ তৈরির কাজ পাচ্ছে। পাচ্ছে ভাল মজুরী। অভাব মিটেছে—সমৃদ্ধি এসেছে হিমালয়ের গহনে।

বদরীনারায়ণের বহু আকর্ষণীয় বস্তুর মধ্যে অলকানন্দা নদীর ওপর বিশ বছর আগের কাঠের পুলটাও আকর্ষণীয়। এটি বর্তমানে লোহার পুলে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রথমবার বদরীনারায়ণে এসে এই পুলটার ওপর দাঁড়িয়ে নিচে অলকানন্দার তীব্র উচ্ছ্বাস দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। অলকানন্দার তীরে ব্রহ্মকুণ্ড এবং ব্রহ্মকপালী। ব্রহ্মকুণ্ড উষ্ণ প্রশ্রবণ। কথিত আছে জগতের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এখানে নাকি বারো হাজার বছর ধরে এক নাগাড়ে তপস্যা করেছিলেন একটি পাথরের ওপর। তাঁর দেহ-নিঃসৃত স্বেদবিন্দু থেকে এই উষ্ণ প্রশ্রবণের সৃষ্টি। এখানে স্নান করলে সব পাপ ধুয়ে যায়। পাপ ধোয় কি-না জানি না, তবে শরীরের ক্লেদ অবশ্যই ধুয়ে যায় এবং এর সঙ্গে অত্যধিক ঠাণ্ডায় গরমকালে স্নানের আনন্দটা তাৎক্ষণিক লাভ। আর এই লোভেই প্রতিটি যাত্রী স্নান করে এখানে। আমি তো দিনে অন্ততঃ দু'বার পাপ ধুয়ে আসি ব্রহ্মকুণ্ডে!

ব্রহ্মকপালী, সান বাঁধানো ঘাট। ওখানে পিতৃপুরুষের পারলৌকিক ক্রিয়া করা হয়। ওখানে পিণ্ড দিলে আর কোথাও পিণ্ড দিতে হয় না। ব্রহ্মকপালীতে নাকি নিজের পিণ্ড নিজে দান করা যায়। পাণ্ডার কাছে শুনেছি আগে এখানে দেবতারা আসতেন পিতৃপুরুষের পারলৌকিক কাজ করতে। এখন মানুষ দেবত্ব লাভ করে এখানে পিণ্ডদান করছে।

সে যাত্রায় বদরীনারায়ণে তিন দিন ছিলাম। সেই তিন দিনে অন্তত বার ছয়েক পুলের ওপর দাঁড়িয়ে অলকানন্দার স্রোতধারা দেখতাম। অনুভব করার চেষ্টা করতাম দেবতাদের কতটা কাছে আসতে পেরেছি।

প্রথম দিন নজরে পড়ে আমার মতোই এক মহিলা ওখানে অলকানন্দার উচ্ছল গতির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

মহিলা তন্বী যুবতী। ছিপছিপে চেহারা। পরনে ম্যাচ করা শাড়ি আর ব্লাউজ। গায়ে নতুন একটা লাল রঙের শাল জড়ানো। সুন্দর কাশ্মীরী কাজ করা তাতে। গায়ের রঙের সঙ্গে শালের লাল রঙ মিশে অদ্ভুত এক লালিত্য ফুটিয়েছে। এক কথায় চোখে লাগার মতো চেহারা মহিলার।

লক্ষ্য করলাম, মহিলা শুধুই অলকানন্দার শোভা দেখছেন না। পুলের ওপর দিয়ে যাতায়াতকারী প্রতিটি মানুষকে খুঁটিয়ে দেখছেন। আমাকেও বার কয়েক দেখা হয়ে গেছে ওঁর।

ইচ্ছে হচ্ছে মহিলার সঙ্গে আলাপ করি। কিন্তু অপরিচয়ের বাধা আমাকে আটকে রেখেছে। অথচ দু'জনে দু'জনকে দেখছি। এ এক অস্বস্তিকর ব্যাপার।

বিদেশ বিভুঁয়ে অপরিচয়ের বাধা থাকে না বেশিক্ষণ। বিশেষত বাঙালী হলে তো কথাই নেই। আলাপের মুখপাতও কঠিন নয় মোটেই। নিজভূমে অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে সহসা আলাপ করা সহজ নয় সবার পক্ষে। সেখানে প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিকের বেড়া দিয়ে ঘেরা। কি মনে করবে কে জানে—এই ভয় আর সংকোচ। বিদেশে—কোথা থেকে আসছেন? কবে এসেছেন? উঠেছেন কোথায়?—ইত্যাদি দিয়ে সহজেই কথা শুরু করা যায়। অপর পক্ষ আগ্রহী হলে আলাপ জমে ওঠে। আলাপ থেকে শেষে প্রলাপ। দোষ নেই কোনো। একটু আধটু মন দেয়া-নেয়া কিংবা হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় মেলাটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। এমন ভূরি ভূরি অভিজ্ঞতা আমার নিজেরই রয়েছে।

আশ্চর্য, এই মহিলার মধ্যে কি একটা যেন আছে যা আকর্ষণ করে কিন্তু কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

কখন যেন সন্ধ্যা নেমেছে বদরীনারায়ণ উপত্যকায়। মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা শাঁখ বাজার শব্দে সম্বিৎ ফিরল আমার। দেখি মহিলা মাথা থেকে শালটা মুড়ি দিয়ে মন্দিরের দিকে চলেছেন দ্রুত পায়ে।

কিসের এক আকর্ষণে আমিও চললাম মহিলার পিছনে। পাথর বাঁধানো পথ অতিক্রম করে দু'পাশে দোকানপাট রেখে মন্দিরের চত্বরে পেঁ ীছলাম। মহিলা সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন ওপরে নাট মন্দিরের দিকে। আমি পিছনে।

নাট মন্দির পার হয়ে গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করে মহিলা প্রণাম জানালেন বদরীবিশালের উদ্দেশ্যে।

আরতি চলছে। শাঁখ ঘণ্টা কাড়ানাকাড়া বাজছে। ধূপ-ধূনোর গন্ধে গর্ভমন্দির ভরে উঠেছে। বেশ কয়েকজন সাধুসন্ত কম্বলমুড়ি দিয়ে আরতি দেখছেন। অনেক যাত্রীও উপস্থিত আরতি দেখার জন্য।

বেশ ভাবগম্ভীর পরিবেশ। কিছুটা পিছনে দাঁড়িয়ে দেখছি আরতি। মাঝে মাঝে মহিলার দিকে তাকাচ্ছি। মহিলা কেমন যেন উসখুশ করছেন। আরতি দেখার দিকে তেমন যেন মন নেই ওঁর। তাকাচ্ছেন আশপাশের কম্বলমুড়ি দেওয়া সাধুদের দিকে, দর্শকদের দিকে। আমার সঙ্গেও বার কয়েক চোখাচোখী হয়ে গেল।

আরতি শেষ হবার আগেই মহিলা গর্ভমন্দির থেকে বেরিয়ে মন্দির পরিক্রমা শুরু করলেন। মন্দিরের চারিদিক ঘেরা বাঁধানো চত্বর। চত্বরের পাশে সারিবন্দী ঘর। ঘরগুলিতে নানা দেবদেবীর মূর্তি। সামনে টানা বারান্দা, সেখানে বহু সাধুসন্ত বসে জপধ্যান করছেন। কেউ কেউ আবার ভাগবত পাঠ করছেন প্রদীপের ক্ষীণ আলোয়। মহিলা মন্দির পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে খুঁটিয়ে দেখছেন সব।

দেখাই স্বাভাবিক।

বদরীনারায়ণের মতো দুর্গম তীর্থে সবাই আসতে পারে না। যারা আসে তারা ভাগ্যবান। তাই সবাই সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে নেয়। বদরীনারায়ণ পৌঁছেই আমি সব কিছু দেখেছি খুঁটিয়ে। এখন কেবল দেবদর্শন। অন্য আকর্ষণ আর নেই।

বাইরে তীব্র ঠাণ্ডা। সাড়ে দশহাজার ফুট উচ্চতায় শীতের কামড় একটু বেশিই হবে। উপত্যকার চারদিকের পর্বতগাত্র সাদা তুষারে

আবৃত। তীব্র উত্তরে হাওয়া বইছে। হিমের পরশ ছড়াচ্ছে বদরীনারায়ণ উপত্যকায়।

মহিলা মন্দির পরিক্রমা শেষ করে ফিরে চললেন। আমিও ফেরার তাগিদ অনুভব করলাম।

পরদিন সকাল থেকে বেশ ক'য়েকবার গেলাম পুলের ওপর।

অলকানন্দার চেহারা পাল্টায় ক্ষণে ক্ষণে। সূর্যের তাপে হিমবাহ গলার ওপর নির্ভর করে জলের হ্রাস-বৃদ্ধি। ভোরের অলকানন্দার যে রূপ, দুপুরের রূপের সঙ্গে তার আকাশ-মাটির ফারাক। ভোরে সে শান্ত —ঘননীল জলরাশি তির তির করে বয়ে যায়। পাথরে আঘাত খেয়ে ছোট ছোট ঢেউ তোলে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চেহারা তার পাল্টে যায়। স্রোতের গতিবেগ হয় তীব্র। জলের ঘননীলে সাদাটে ভাবটা বাড়ে। দুপুরে নদী যেন মত্ত হস্তিনী। জলে অজস্র ফেনা তুলে পাথরের গায়ে আছাড় খেয়ে অলকানন্দা ছুটে চলে সাগর সন্ধানে।

নদীর গতির সঙ্গে মনের গতির বিচিত্র মিল দেখছি। স্থায়ীভাবে অলকানন্দার রূপে মজে থাকতে পারছি না। অথচ নদীর এই রূপ দেখার জন্য নিত্য পুলের ওপরে এসে দাঁড়ানো আমার। বুঝতে পারছি মন আমার খুঁজছে গতকালের দেখা সেই তন্বী যুবতীকে। সে কি আসবে?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নজরে পড়ল বদরীনারায়ণ পোষ্ট অপিসের পাশ কাটিয়ে চড়াই পথে মহিলা আসছেন। ধীর গতি অথচ অদ্ভুত ছন্দময়। দৃঢ় ঋজু ভঙ্গিতে হাঁটছেন মহিলা। নির্জন পথে যেন কোন রাজেন্দ্রানী চলেছেন আপন মহিমায়।

চড়াই পথটায় বাঁক নিয়ে মহিলা তাকালেন পুলের দিকে। চোখে চোখ পড়ে গেল আমার। মনের নিভৃতে বিচিত্র এক আনন্দ যেন দোলা দিয়ে গেল।

মহিলা পুলের ওপর উঠে এলেন।

আজও সেই একই বেশবাস। গায়ে টকটকে লাল কাশ্মীরী শাল। কপালে বড়সড় একটা সিঁদূরের গোল টিপ। সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদূর লাগানো।

পুলের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে থাকায় মহিলাকে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পেলাম। কিন্তু ওঁর সিঁথির সিঁদূর আজ আমার উচ্ছ্বাসে আচমকা একটা ধাক্কা দিল যেন।

মহিলা সরাসরি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। নমনীয় অথচ দীপ্ত ভঙ্গিমা। কোনো রকম সংকোচের বালাই নেই। মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, বাঙালী তো?

আমিও মৃদু হাসলাম, অপরিচয়ের সংকোচ দূর হল। মাথা হেলিয়ে সায় দিলাম ওঁর প্রশ্নে।

মহিলা প্রশ্ন করলেন, বাড়ি কোথায়?

কলকাতায়।

কবে এসেছেন বদরীনারায়ণে?

গতকাল।

কাল সন্ধ্যায় এখানে ছিলেন, তাই না?

মৃদু হাসলাম। বললাম, আপনিও তো ছিলেন।

মহিলা বললেন, হ্যাঁ। কাল ভাবছিলাম আলাপ করি। কিন্তু দূর থেকে আপনার চেহারাপত্র দেখে মনে হয়েছিল অবাঙালী। বাঙালী হলে আপনি নিজেই আলাপ করতেন।

আমি বললাম, আমারও কাল ইচ্ছে হচ্ছিল আলাপ করি আপনার সঙ্গে, কিন্তু কেমন যেন সাহস হল না। তাই···

মহিলার কণ্ঠে উচ্ছল ঝরনার সুর বেজে উঠল। হাসতে হাসতেই বললেন, কেন, আমার মধ্যে আবার ভয়ের কিছু পেলেন না-কি?

অপ্রতীভ না হয়েই বললাম, না, তা নয়, আসলে আমি ভেবেছিলাম, অচেনা মেয়ে···আলাপ করতে গেলে কিছু আবার মনে করে না বসেন। অবশ্য আজ আপনি আলাপ না করলেও, আমি করতাম।

মহিলা রহস্যভরা দৃষ্টিতে আমার মুখে তাকিয়ে বললেন, তাই বুঝি ? আজকে আর ভয় করছে না ?

উঁহু...

একটু যেন বিস্ময়ের ভান করে জিজ্ঞেস করলেন, কেন বলুন তো ?

আমি মুচকি হেসে মহিলার সিঁথির দিকে ঈশারা করে বললাম, ওই সিঁদুর।

মহিলার হাসিমুখ মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল। বিচিত্র দৃষ্টিতে আমার মুখে তাকিয়ে থাকলেন খানিক। কি ভাবলেন জানি না। তারপর হঠাৎই মুখ ফিরিয়ে নিলেন উনি অলকানন্দার দিকে। তীব্র গতির উন্মাদনায় অলকানন্দা তখন পুলের নিচে একটা বড় পাথরে বাধা পেয়ে ঘূর্নিপাক খাচ্ছে।

মহিলার আচমকা গম্ভীর হয়ে যাওয়াটা আমার কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগল। বুঝতে পারছি না, খুব গর্হিত কোনো মন্তব্য করে ফেলেছি কি-না। আলাপের সহজ সুরটা এমন ভাবে কেটে যাওয়ায় খুবই বিব্রত বোধ করলাম।

আমতা আমতা করে বললাম, দেখুন, আমি কিন্তু কিছু ভেবে বলিনি কথাটা।

মহিলা অল্প সময়ের মধ্যেই দেখলাম আবার বেশ সহজ হয়ে উঠলেন। অলকানন্দার ঘূর্ণিপাক থেকে আমার মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, আমি কি তাই বলেছি ? যাক্‌গে, একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে। মহিলা সহজ ভাবে বললেন, শুনেছি এখানে অনেক সাধু সন্ন্যাসী আছেন। আমি তাঁদের কাউকেই দেখিনি এ ক'দিন। আপনি দেখেছেন কোনো সাধু সন্ন্যাসী ?

মন্দিরের আশপাশে তো বহু সাধু সন্ন্যাসী রয়েছেন। দেখেন নি তাঁদের ?

কই, না-তো !

বলেন কি ? তাহলে চিনতে পারেন নি।

কোথায় থাকেন তাঁরা ? কোনো আশ্রম-টাশ্রম আছে না-কি এখানে ?

আশ্রম আর গুহা ছাড়াও সকাল সন্ধ্যায় মন্দিরের মধ্যে এবং বাইরে বহু সাধু সন্ন্যাসী আসেন। অনেকেই মন্দিরের মধ্যে জপ-ধ্যান করেন। জটাজুটধারী সন্ন্যাসী, চিনতে তো কোনো অসুবিধে হয় না।

মহিলা অনুকম্পার হাসি হেসে বললেন, ওঁদের সাধু না বলে ভিখিরী বলতে পারেন। সেজেগুজে মন্দিরের আশপাশে সব বসে থাকেন ভিক্ষের জন্য। কালীঘাটের মন্দিরের কাছে বসা কাঙালিদের সঙ্গে ওঁদের তফাৎ কোথায় তা তো দেখি না। যাত্রীদের দানে যাদের দিন চলে তারা সাধু নয়।

ঈষৎ প্রতিবাদের সুরে বললাম, ভিক্ষে করেন বলে ওঁদের সাধনাকে ছোট করে দেখবেন না। প্রতিটি সাধুরই হয় যাত্রীর দানে না হয় ভক্তের প্রণামীতে চলে। এমন কি বদরীবিশালেরও ভোগ হয় ভক্তের দানের অর্থে। সন্ন্যাস জীবনে মাধুকরী বৃত্তির নির্দেশও আছে।

মহিলা আমার কথা শুনলেন মন দিয়ে তারপর বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, আমি কারো সাধনাকে ছোট করে দেখিনি দেখতে চাইও না। কিন্তু সাধনা করতে এসে মাধুকরী বৃত্তিতেই তো ওঁদের সময় কেটে গেল। সাধনা করবেন কখন ?

খানিক চুপচাপ দূর আকাশের ঘন নীলিমার দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে বললেন, নিঃসঙ্গ হিমালয়ে সাধনা করতে এসে ভাত কাপড়ের চিন্তার চেয়ে সংসারে থাকলে ওসব নিশ্চয় জুটত এবং ঈশ্বর দর্শনও হত। রামকৃষ্ণদেব সংসারে থেকেই ঈশ্বর দর্শন করেছেন। তাঁকে হিমালয়ে এসে ঈশ্বরকে খুঁজতে হয়নি।

কথাগুলোর যুক্তি থাক বা না থাক, মহিলার চোখমুখে উত্তেজনা দেখে কোনো প্রতিবাদ বা ভিক্ষে করা সাধুদের স্বপক্ষে কিছু বলে আর উত্তেজনা বাড়াতে চাইলাম না। চুপ করে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

মহিলা আবার বললেন, যাই বলুন, সত্যিকারের সাধু একজনও দেখলাম না।

সত্যিকারের সাধু বলতে কাদের বোঝাচ্ছেন ?

যাঁরা নির্জনে লোকচক্ষুর আড়ালে একান্ত সাধনা করেন আমি তাঁদের কথাই বলছি। তেমন সাধু এখানে কোথায় ?

আপনি মানা গ্রাম বা বসুধারা অঞ্চলে গেছেন ? ওদিকে শুনেছি অনেক বড় বড় সাধু মহাত্মা নির্জনে সাধনা করেন।

মহিলা সামান্য আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন, মানা, বসুধারা আবার কোথায় ?

এখান থেকে প্রায় দু' তিন মাইল দূরে মানা গ্রাম। বসুধারা ওখান থেকে আরো দু' মাইল দূরে। ওখানে অনেক সাধুর দেখা পেতে পারেন।

মহিলা বললেন, আমায় নিয়ে যাবেন ?

নিশ্চয়।

কবে যাবেন ?

কালই চলুন। সকালবেলা বেরুলে বিকেলে মানা গ্রাম আর বসুধারা দেখে ফিরে আসা যাবে।

মহিলা প্রশ্ন করলেন, কোথায় উঠেছেন ?

বললাম, ধীরেন ভট্টর ধর্মশালায়।

কাল সকালেই দেখা করব আপনার ওখানে।

ব্যস্ত হয়ে বলি, আপনাকে কষ্ট করে আসতে হবে না। আমিই ডেকে নেব। কোন ধর্মশালায় আছেন ?

আছি তো পাশাপাশি, কষ্ট আর কি ? আপনি রেডি থাকবেন, কেমন ?

ইচ্ছে থাকলেও বলতে পারলাম না—আপনাকে ডেকে নিলে আমি খুশি হতাম।

মহিলা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, চলুন, এবার ফেরা যাক। ফিরবেন তো?

চলুন।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মন্দিরে বদরীনারায়ণের আরতির সময় হয়েছে। উত্তরে হিমেল হাওয়া বইছে। দেহের কোষে কোষে হিম শিহরণ অনুভব করছি। অলকানন্দার জলে এখন সন্ধ্যাকাশের ছায়া পড়েছে। নীলচে জল এখন কালো। স্রোতের গতিটাও বড় উদ্দাম।

দু'জনে ফিরে চলেছি। হাঁটছি পাশাপাশি।

অলকানন্দার পাশ দিয়ে পাথর বাঁধানো উৎরাই পথে আবছা অন্ধকার নেমেছে। চলেছি উৎরাই পথে মন্দিরের দিকে। মনে অসংখ্য প্রশ্ন। কে এই মহিলা? একাকী কেন? সঙ্গে নিশ্চয় লোকজন আছেন। তাঁরা কোথায়? নিজের আস্তানার খবর ইচ্ছে করেই জানালেন না। কিন্তু কেন?

কাচের জানলার মধ্য দিয়ে সকালের সূর্যের অনুত্তাপ আলোর রশ্মী আমার ঘরে লুটিয়ে পড়তেই ঘুম ভেঙ্গে গেলে। দোতলার ঘর, নদীর ঠিক ওপরে। তাই উন্মুক্ত পূর্ব আকাশে সূর্য উঠলেই প্রথম আলো এ-বাড়ির সবকটা পূবমুখো ঘরেই প্রবেশ করে।

প্রচণ্ড শীত। মোটা মোটা তিনটে ভোট কম্বলের নিচে অফুরন্ত উষ্ণতা। এই উষ্ণতার মায়া কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসা অসম্ভব। চোখ মেলে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইলাম।

হঠাৎ বাইরে নারী কণ্ঠের ডাকে চমকে উঠলাম। সেই মহিলার কণ্ঠস্বর। এত সকালে এসে পড়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম সুখশয্যা ছেড়ে। পোষাক পালটে বাইরে বেরিয়ে দেখি মহিলা একা। মনে মনে খুবই বিস্মিত হলাম। বললাম, একটু বসুন আমার ঘরে। পাঁচ মিনিটেই তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

মহিলা হেসে বললেন, এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোন কি করে ?

লজ্জা পেয়ে বললাম, আজ একটু বেশি বেলা হয়ে গেছে। আপনি একটু বসুন আমি তৈরি হয়ে আসছি।

অল্প সময়ের মধ্যে প্রাতঃকৃত সেরে তৈরি হয়ে নিলাম। মহিলা একাকী জানলার বাইরে তাকিয়ে বসে ছিলেন। সকালের রাঙা আলো ওঁর মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। বড় মিষ্টি লাগছে ওঁকে।

আমাকে প্রবেশ করতে দেখে মহিলা প্রশ্ন করলেন, আগে আর কখনো এসেছেন এখানে ?

না, এই প্রথম।

তবে সাধু সন্ন্যাসীর এত খোঁজ পেলেন কেমন করে ? ও সব সঙ্গ টঙ্গ করেন না-কি ?

হাসলাম বেশ শব্দ করে। বললাম, না। ওসব আমার ধাতে সইবে না।

মহিলা ঔৎসুক্য প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলেন, কেন সইবে না ?

আবার হাসলাম। বললাম, এমন সুখের শরীরটা অনাহারে অনিদ্রায় নষ্ট করার ইচ্ছে নেই বলে।

সাধুরা বুঝি অনাহারে অনিদ্রায় থাকে ?

না হলে তো তাদের মাধুকরী করতে হবে। আপনার আবার মাধুকরী পছন্দ নয়।

আমার কথায় মহিলা খিলখিল করে হেসে উঠে বললেন, আমাকে জব্দ করছেন তো ? করুন।

না, না। ওটা কথার কথা বললাম। সাধু সন্ন্যাসীদের কথা শুনেছি পাণ্ডাদের কাছে।

মহিলা আবার কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়লেন। স্বগতোক্তির মতো বললেন, আমিও তো তাই শুনে এলাম এতদূর। অথচ একজনও সত্যিকারের সাধুর দেখা পেলাম না এতদিনে।

আশ্বাস দিয়ে বলি, চলুন না আজ, দেখা যাবে। সত্যিকারের সন্ন্যাসীর দেখা মিললেও মিলতে তো পারে।

মহিলা সাধু সন্দর্শনে এতটা পথ এসেছেন ভাবতে কেমন যেন অবাক লাগছে। অনেক অনেক প্রশ্ন জমা হচ্ছে? কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞেস করতে বাধছে। নিজের কৌতূহল দমন করছি।

দোকান থেকে চা সিঙাড়া দিয়ে গেল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে শরীরের উত্তাপ ফিরে এলো। মহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, একা যাবেন না-কি?

মহিলা বললেন, হ্যাঁ।

আর কাউকে সঙ্গে আনলে পারতেন।

মিষ্টি করে হেসে মহিলা বললেন, এ-সব ব্যাপারে ভিড় না বাড়ানোই ভাল।

প্রথমটা অস্বস্তি হলেও মহিলার সপ্রতীভ জবাব শোনার পর এবং ওঁকে একাকী পাবার কথা ভেবে মনে মনে খুবই খুশি হলাম। উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করে বরং কিছুটা ঠাট্টার সুরে বললাম, সত্যিকারের ভাল সাধু পেলে একাই পরমার্থের ভাগ বসাবেন, তাই না?

মহিলা চোখটিপে হেসে জবাব দিলেন, দেখাই যাক।

তৈরি হয়েই ছিলাম, চায়ের পাট শেষ করে মহিলাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মানা গ্রামের দিকে।

মন্দিরের পাশ দিয়ে অলকানন্দা নদীর গা ঘেঁসে মেটে পথ। বাঁ দিকে মন্দির আর ডান দিকে ব্রহ্মকপালী ও উষ্ণকুণ্ডকে রেখে এগিয়ে চলি সামনের দিকে। ব্রহ্মকপালীর সানবাঁধানো সিঁড়ির ওপরে পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট ঝোপড়া। ঝোপড়ার উন্মুক্ত দরজা। বারান্দায় এই কাকডাকা ভোরে সাধুরা বিভূতি মেখে এলো গায়ে বসে আছেন ধুনি জ্বালিয়ে। দেখে মনে হয় বুঝি সারারাতই ওঁরা এমন ভাবে ধ্যানস্থ ছিলেন। মহিলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন সেই নাঙ্গা সাধুদের।

মন্দির এলাকা পার হয়ে চাষের বিস্তীর্ন ঢেউ খেলানো জমি। সেই জমির মাঝখান দিয়ে পথ। এ দিকটা জনশূন্য, লোকালয় নেই। পশ্চিম দিকের পাহাড়ের গা থেকে বিশাল সমতল জমি অলকানন্দা নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অঞ্চলে এ-টুকুই যা চাষের জমি। পাহাড়ী কৃষক যুগ-যুগান্ত ধরে কঠিন শিলার বুকে রক্ত ঝরিয়ে তৈরি করেছে এই চাষের জমিটুকু। তাই আজ সামান্য পরিশ্রমেও অমৃত জন্মায় এ জমিতে।

চাষের মরসুম তাই পথে মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে। মানা গ্রামের মানুষ হাল-বলদ নিয়ে জমির কাজে লেগে গেছে। এখানে আলু আর মাড়ুয়ার চাষ হয় কেবল। কিছু তামাক পাতার চাষ করে নিজেদের প্রয়োজনে।

পাশাপাশি হাঁটছি আমরা। মাঝে মাঝে মহিলা দু'একটা প্রশ্ন করছেন এ অঞ্চলের মানুষ আর চাষবাস সম্বন্ধে। যতটুকু জানি তার চেয়ে কিছু বাড়িয়ে বলছি। যাতে উনি আমায় আরো প্রশ্ন করতে পারেন। দেখলাম তেমন আগ্রহ নেই। কিসের এক ভাবনায় যেন উনি বিভোর হয়ে আছেন।

হাতের কাজ ফেলে চাষীরা চেয়ে আছে আমাদের দিকে। এদিকে তীর্থযাত্রীরা আসে না বলতে গেলে, তাই নতুন মানুষজন দেখলে তাকিয়ে থাকে। চোখে চোখ পড়লে মিষ্টি হেসে 'জয় হিন্দ' বলে অভিবাদন করে।

মহিলা হঠাৎ বলে উঠলেন, লোকগুলো অমন হাঁ করে কি দেখছে? মানুষজন দেখেনি না-কি কখনো? ওদের হাভ ভাব আমার ভাল মনে হচ্ছে না।

মহিলার কথায় বেশ জোরেই হেসে উঠলাম। বললাম, ভয় পাবেন না। আসলে ভিনদেশী মানুষ আমরা তাই অমন ভাবে দেখছে। আমাদের চেহারা, পোষাক-আষাক আর চাল চলন ওদের চোখে নতুন ঠেকছে। তাছাড়া, সমতলের মানুষ বদরীনারায়ণে এলেও

এদিকে আসেনা সচরাচর। হিমালয়ের এ-সব মানুষ যেমন সৎ, তেমনই সরল। আলাপ করবেন ওদের সঙ্গে ?

না, না। চলুন এগিয়ে যাই।

আমার প্রস্তাব শুনে মহিলা হঠাৎ চলার গতি বাড়িয়ে দেওয়ায় মনে মনে হাসলাম। শহর সভ্যতায় মানুষ হয়ে সাধারণ মানুষকে আমরা কত অবহেলা আর অবজ্ঞা করি। অথচ এই মানুষগুলোর সঙ্গে মিশে এদের হৃদয়ে যদি একবার প্রবেশ করা যায়, তাহলে আমাদের শহুরে সভ্যতায় গড়া মন এদের সরলতার কাছে লজ্জা পাবে। হিমালয়ের মানুষের সরলতা আর হৃদয়বত্তার তুলনা পাওয়া যাবে না কোথাও।

পথ শেষ হল অলকানন্দা নদীর ওপর ঝোলান সেতুর কাছে।

সেতু পার হয়ে কিছুটা চড়াই ওঠার পর আমরা প্রবেশ করলাম এ অঞ্চলের সর্বশেষ জনপদে।

গ্রামটির নাম মানা। এখান থেকে প্রায় তিরিশ মাইল দূরে ভারত-তিব্বত সীমান্ত মানা পাস। মানা গিরিবর্ত্মের নাম থেকে গ্রামের নাম হয়েছে মানা। বহু মানুষের বাস এ-গ্রামে।

পুরান এবং মহাভারতে মানা গ্রামের মানুষকে বলা হয়েছে মার্চা বা গন্ধর্ব জাতি। বহু প্রাচীন সভ্যতা এদের। সংগীত শিল্পে এদের পারদর্শিতা অসীম। ঘরে ঘরে শিশু থেকে বৃদ্ধ নর নারী কার্পেটে অপূর্ব শিল্প সৃষ্টি করে চলেছে।

দূর থেকে গ্রামটি নোংরা দেখে মহিলা রুমাল বার করে নাকে চেপে ধরেন। হাসি মনে মনে। বলি, বাইরে নোংরা হলেও ভেতরে এরা খুবই পরিস্কার।

মহিলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আগে তো আসেন নি বললেন, কি করে জানলেন এদের ভেতর পরিস্কার ?

এখানে না এলেও অন্য পাহাড়ী মানুষের গ্রাম আর ঘর-দোর দেখেছি।

মহিলা উত্তর দিলেন না বটে, তবে নাক থেকে রুমালটাকে নামালেন না।

গ্রামে প্রবেশ করে প্রতিটি ঘরের দাওয়ায় মেয়ে-পুরুষের কার্পেটের কাজ দেখে হতবাক মহিলা। পথ ঘাট সত্যি বড় নোংরা তবে ঘরের আঙিনা তকতকে ঝকঝকে।

গ্রামে ঘোরার পর মহিলাকে বেশ খুশি হতে দেখলাম।

গ্রামের সামান্য দূরে ব্যাসগুহা। খুবই বিখ্যাত স্থান। গ্রামের মানুষের কাছে খোঁজ-খবর নিয়ে জানলাম, ওখানে কয়েকজন সাধু আছেন। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সারা বছরই তাঁরা থাকেন এখানে।

কিছুটা চড়াই পথ উঠে পেলাম ব্যাসগুহা। গুহার মধ্যে ধুনি জ্বালিয়ে এক সাধু বসে আছেন। বেশ প্রাচীন সাধু বলে মনে হল। মহিলা ভক্তি-ভরে প্রণাম করতে সাধু বসতে আজ্ঞা করলেন তাঁকে। আমি বাইরে চলে এলাম। যদি কোনো গোপন প্রশ্ন থাকে তাহলে সুবিধে হবে ওঁর।

অল্প কিছুক্ষণ বাদেই মহিলা ফিরে এলেন। মুখ দেখে মনে হল না খুশি হয়েছেন। তবু জিজ্ঞেস করলাম কেমন সাধু? ভেজাল টেজাল আছে নাকি?

বিমর্ষ হেসে মহিলা বললেন, ভেজাল নয়, তবে খুবই বৃদ্ধ।

অবাক হলাম ওঁর কথায়। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীরাই তো বেশি জ্ঞানী হন। আসলে মহিলা কি চান তা বুঝতে পারছিনা। পাশাপাশি আরো কয়েকটি গুহায় ঘুরলাম। দর্শন হল বেশ কয়েকজন সাধুর সঙ্গে। সবাই বয়সে প্রাচীন। দেখলাম মহিলা ওই সব সাধুর দর্শন পেয়েও তৃপ্ত নয়।

গ্রামে ফিরে এলাম। গ্রামবাসীদের কাছে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, বসুধারা এবং এদিকের গুহায় যে সব সন্ন্যাসীরা আছেন তাঁরা সবাই খুবই প্রাচীন। নবীন সন্ন্যাসীরা কেউই এক স্থানে থাকেন না। গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী নানা স্থান ভ্রমণ করতে হয় তাঁদের। সময়

হলে তবেই তাঁরা স্থায়ী আসন করেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠাও করেন কেউ কেউ।

খানিক বিশ্রাম নেবার পর মহিলা বললেন, চলুন ফিরি।

বসুধারা যাবেন না?

না।

সামান্যমাত্র পথ। ভাল সাধু পেতে পারেন ওখানে।

দরকার নেই। চলুন ফিরে যাই।

মহিলার ভাবসাব দেখে সত্যি অবাক হলাম। এত পথ এসে এতগুলি সাধু দেখার পরও মনের কোনো পরিবর্তন হল না। আসলে উনি কি চান তা বোধহয় নিজেও জানেন না। সবটা কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে আমার। ফলে মহিলার সম্বন্ধে কৌতূহল বাড়ছেই।

ফিরে চলেছি মানাগ্রাম থেকে বদরীনারায়ণের পথে। চুপচাপ নির্জন প্রান্তরে পাশাপাশি চলতে চলতে আমার অদম্য কৌতূহল বাঁধনহারা হয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করে বসলাম, কাকে খুঁজছেন বলুন তো?

মহিলা দারুণ ভাবে চমকে উঠলেন প্রথম, তারপর আমার মুখে পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন।

আপত্তি না থাকলে বলতে পারেন আমায়। সাহায্য করতে পারি।

মহিলা যেন জ্বলে উঠলেন। সারা মুখে রক্ত নেমে এসেছে। ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, আপনার কৌতূহল দেখছি খুব বেশি। এতটা কিন্তু ভাল নয়।

লজ্জা আর অপমানে মাথা হেঁট হয়ে গেল আমার। হঠাৎ এত চটে যাবার কারণ বুঝতে পারলাম না। এমন কিছু গর্হিত প্রশ্ন করিনি। তবু এমন চটে যাওয়ায় ক্ষমা চেয়ে নিলাম মহিলার কাছে। উনি ক্ষমা করলেন কি না বুঝলাম না।

ধর্মশালায় ফেরা পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথে পাশাপাশি হেঁটে এলেও কোনো কথা আর বলতে পারলাম না। মহিলাও ব্যাপারটা সহজ করে নেননি বলে মনে হল।

বদরীনারায়ণে থাকার নির্দিষ্ট মেয়াদ ফুরোবার আগেই পালালাম ওখান থেকে। পাছে মহিলার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যায় এই আশংকায়।

এর পর অনেকগুলি বছর কেটে গেছে।

ইতিমধ্যে হিমালয়ের নানা প্রান্তে ঘুরেছি। কখনো তীর্থযাত্রী-রূপে কখনো পর্যটকরূপে আবার কখনো পর্বত-অভিযাত্রীরূপে। বহু স্থানে ঘুরলেও বদরীনারায়ণে আসিনি তারপর।

দ্বিতীয়বার এক পর্বত অভিযানের শেষে বদরীনারায়ণে এসে মহিলার প্রায় সামনা সামনি পড়ে চমকে উঠেছি। সেই একই ম্যাচ করা সাড়ি-ব্লাউজ আর লাল শাল। চেহারার চটকে মরা জোয়ারের স্রোত।

এক গাল দাড়ি গোঁফ নিয়ে বিচিত্র বেশবাস আমার। অলকানন্দার পুল পার হয়ে মন্দিরে আসার পথে চোখাচোখি হয়ে যাওয়ায় বিব্রত বোধ করেছি। প্রথমবারের সেই ধমক ভুলিনি। তাই ওঁকে এড়িয়ে লম্বা পায়ে চলে এসেছি। ভাগ্য ভাল বহু মানুষের ভিড়ে এবং দীর্ঘ দিনের অদর্শনে উনি আমায় চিনতে পারেন নি।

একদিন মাত্র ছিলাম বদরীনারায়ণে।

তিনদিন থাকার ইচ্ছে ছিল। মহিলাকে দেখার পর আর ওখানে থাকার ইচ্ছে থাকল না। যে দিনটা থাকলাম সে দিন মহিলাকে দেখেছি কখনো অলকানন্দা নদীর ওপর পুলে দাঁড়িয়ে চলমান যাত্রীর স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকতে; আবার কখনো মন্দিরে অথবা তপ্তকুণ্ডে ঘুরে বেড়াতে। কাকে খোঁজেন আর কি-ই বা খোঁজেন

উনি, জানি না। কয়েকবারই চোখাচোখি হয়েছে। সযত্নে আড়াল নিয়ে পাশ কাটিয়েছি।

পরের দিন সকালে মহিলাকে এড়িয়ে বদরীনারায়ণ ত্যাগ করি।

বারবার তিনবার!

আপ্ত বাক্যটা মিলে গেল অদ্ভুতভাবে।

এ-বারও সেই একই মহিলার মুখোমুখি নাটকীয় পরিস্থিতিতে।

অলকানন্দা নদীর এপারে বাস স্ট্যাণ্ড। মাত্র কয়েক বছর হল বাস সরাসরি হৃষীকেশ থেকে বদরীনারায়ণে আসছে যাত্রী নিয়ে। কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর পথ থেকেও সরাসরি যাত্রীরা আসছে বাসে।

অলকানন্দার এ পারের নিঃসঙ্গ রুক্ষ চেহারা একেবারেই বদলে গেছে। বিস্তীর্ণ জমিতে বহু মঠ, ধর্মশালা, বিশ্রামভবন হোটেল ইত্যাদি হয়েছে। যাত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য নানা ব্যবস্থা আছে। উঁচু নিচু জমি সমান করে ব্যাস স্ট্যাণ্ড বানানো হয়েছে। ফলে যাত্রীর ভীড়ে বদরীনারায়ণ সরগরম।

বাস থেকে নেমে তড়িঘড়ি মন্দিরের দিকে চলেছি। আগামীকাল মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে। কার্ত্তিক থেকে চৈত্র এই সুদীর্ঘ পাঁচ-ছ' মাস বদরীনারায়ণ মন্দির এবং নারায়ণ স্বয়ং থাকবেন একাকী। অবশ্য তাঁর পূজা ভোগ আরতি সবই তিনি পাবেন নিয়মিত যোশীমঠ থেকে। যোশীমঠে বদরীনারায়ণজীর গদি আছে। পূজারী নাম্বুদ্রি রাওল শীতকালে যোশীমঠে থেকে নারায়ণের নিত্যপূজা করেন। এ সময় আট-দশ ফুট বরফে ঢাকা থাকে সমগ্র বদরীনারায়ণ উপত্যকা। মানা গ্রামের দু'চার ঘর মানুষ ছাড়া আর থাকবেন কয়েকজন সাধু সন্ন্যাসী। বাকি সবাই নেমে যাবে নিচের জনপদে। যেখানে বরফ কম পড়ে।

মন্দির বন্ধের সময়টায় ভীড় কম থাকে বলে দর্শন বড় ভাল হয়। সে কারণেই চলেছি দ্রুত।

কয়েক পা এগিয়ে একটা যাত্রী-বাসের সামনে ছোটখাট এক ভীড়ের মধ্যে সেই মহিলাকে দেখলাম। পাশ কাটাতে যাব, হঠাৎ কানে এলো, মা, আজ এই গাড়িতে তোমায় ফিরতেই হবে। দেখছ না সবাই চলে যাচ্ছে। কাল মন্দির বন্ধ করে আমরাও ফিরব। শীতে এখানে কোনো মানুষ থাকতে পারে না। ঠাণ্ডায় জমে শেষ হয়ে যাবে মা। নাও, ওঠো।

মহিলা দৃঢ়ভাবে বললেন, না। আমি এখানেই থাকব। অত বড় মহাপুরুষ আমায় বলেছেন, তিনি এখানেই দেখা দেবেন। তাঁর সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত আমি বদরীনাথ ছেড়ে যাব না। তাতে যদি মরতে হয় এখানেই মরব।

মহিলার একরোখা ভাব। পাণ্ডাজী বেশ বিব্রত। বাসের ড্রাইভার হর্ণ দিচ্ছে। অন্য যাত্রীরা সবাই বাসে উঠে পড়েছে। কনডাকটর মহিলাকে বোঝাবার শেষ চেষ্টা করে বলল, আজই চলুন বহিনজী। কাল থেকে আর আমরা ওপরে আসব না। কোনো বাসই আর এখানে আসবে না। আপনাকে পায়ে হেঁটে ফিরতে হবে যোশীমঠ। বিশ মাইল রাস্তা বহুৎ তকলিফ্ হবে।

মহিলা কোনো জবাব দিলেন না। বাসেও উঠলেন না। একে একে সব বাসই হর্ণ বাজিয়ে ধুলো উড়িয়ে বদরীনারায়ণ ছেড়ে চলেগেল নিচে।

পাণ্ডাজী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ভুল করলে মা। তোমার ফিরে যাওয়া উচিত ছিল এই বাসে। খানিক ভেবে নিয়ে আবার বললেন, যাই হক, আজ রাতটা চিন্তা করে দেখ। কালই কিন্তু শেষ দিন। কাল তোমায় ফিরতেই হবে বদরীনারায়ণ থেকে।

চলে আসছিলাম, পাণ্ডাজীর সঙ্গে চোখাচখি হওয়ায় স্মিত হেসে কুশল সংবাদ নিলেন। মহিলা আমার মুখ জরীপ করে নিলেন খানিক। মনে মনে শংকিত হলাম।

পাণ্ডাজী উৎরাই পথে চললেন মন্দিরের দিকে। মহিলা মাথা নিচু করে চললেন ওঁর পিছনে। আমিও চললাম সঙ্গে। মন্দিরের কয়েকটি বাড়ি আগে এক ধর্মশালায় মহিলাকে রেখে বাইরে আসতেই ধরলাম পাণ্ডাজীকে। উনি আমার পূর্ব পরিচিত। কুশল সংবাদ আদান প্রদানের পর জিজ্ঞেস করলাম মহিলার কথা।

মহিলা কি প্রতি বছর আসেন এখানে ?

পাণ্ডাজী সায় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ। সেই বৈশাখে মন্দির খোলার সময় থেকে কার্ত্তিক মাসে দেওয়ালীর পর মন্দির বন্ধ হওয়া পর্যন্ত এখানে থাকে প্রতি বছর।

আমি ওঁকে তিনবার দেখলাম এখানে। উনি কি প্রতি বছর আপনার কাছেই ওঠেন ?

হ্যাঁ। গত বিশ বছর যাতায়াত করছে। থাকেও আমরই বাড়িতে। পাণ্ডাজী আনমনা হয়ে বলতে থাকেন, কত বড় বংশ আর পয়সাঅলা ঘরের মেয়ে আর বউ। না দেখলে বিশ্বাস হবে না। প্রতিবার শীতে কলকাতায় যাই। ওর শ্বশুরবাড়ি না হয় বাপের বাড়িতে গিয়ে উঠি। খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করে আমায়। মেয়েটার ওপর বড় মায়া পড়ে গেছে, বুঝলেন ? নিজের মেয়ে নেই। মনে হয় তাই বুঝি নারায়ণ ওকে পাঠিয়েছেন আমারই কাছে। বড় দুঃখী মেয়ে।

কথা বলতে বলতে মন্দিরের কাছে এসে গেছি। পাণ্ডাজী বললেন, উঠবেন কোথায় ? ঘর ঠিক হয়েছে ?

হেসে বললাম, এই তো এলাম। আগে দর্শন করি, তারপর ঘর খুঁজে নেওয়া যাবে।

পাণ্ডাজী বললেন, অন্ধ্র ধর্মশালার সব ঘরই খালি আছে। চান তো ওখানে থাকতে পারেন। তপ্তকুণ্ড ও মন্দিরের সামনে—ভালই লাগবে আপনার।

রাজী হয়ে গেলাম। বদরীনারায়ণজী দর্শন করে পাণ্ডাজীর সঙ্গেই ফিরে এলাম। উঠলাম অন্ধ্র ধর্মশালায়।

চৌকিদারকে ডেকে পূবদিকে ব্রহ্মকুণ্ডের ঠিক ওপরের ছোট ঘরটা খুলে দেবার ব্যবস্থা করলেন। ঘরে বড় বড় কাচের জানলা। জানলা দিয়ে হিমালয় প্রকৃতি আর মন্দির সুন্দর দেখা যায়।

যাওয়ার সময় পাণ্ডাজী বলে গেলেন, সন্ধ্যা আরতির পর আসব। আপনার কিছু পরামর্শ দরকার।

মনে মনে এমনটাই আশা করছিলাম।

খানিক বিশ্রাম নিয়ে খাওয়ার সন্ধানে বেরিয়েছি।

মন্দিরের সামনে রাস্তার দু'পাশে দোকান-পাট, খাবার দাবার, পূজা-উপচার, বেনেমশলা, ফটোবাঁধাই এবং চায়ের দোকান সবই আছে। এটিই বদরীনারায়ণের বাজার। বহু নতুন নতুন সাজানো-গোছানো আধুনিক দোকান গজিয়ে উঠেছে সরাসরি বাস পথ তৈরি হওয়ায়। মরসুমের শেষ, তাই বেশির ভাগ দোকান বন্ধ। গত সপ্তায় বন্ধ হয়ে গেছে সরকারী চিকিৎসাকেন্দ্র এবং ডাক ও তার অফিস। এ-সবই মরসুমী। মরসুম শেষ হলেই ছ'মাসের জন্য দরজায় তালা বন্ধ করে নেমে যায় নিচের জনপদে। খোলা আছে কেবল খাবার, পূজা-উপচার, ফটো এবং চায়ের গুটি ক'য়েক দোকান। আগামীকাল অথবা পরশু সবকটি দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত হবে বদরীনারায়ণ।

শুনুন ?

থমকে দাঁড়ালাম। সেই মহিলা আমার সামনে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছেন!

মহিলার চেহারা রীতিমত খারাপ হয়ে গেছে। চোখে-মুখে নেই আগের সেই দীপ্তি। দেহে নেই আগের ঔজ্জ্বল্য। নেই যৌবনের কোনো চটক। যেটা দেখে আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। বয়সই এর কারণ। চল্লিশ পার করে দিয়েছেন নিশ্চয়। জামা কাপড়ও আগের

মতো ঝকঝকে নয়, যদিও ম্যাচ করা। লাল শালটা রঙ চটে বিবর্ণ, কাশ্মীরি কাজগুলো আর যেন নজরেই পড়ে না। অনেকটা যোগিনীর মূর্তি। তবে চোখ দুটি দেখবার মতো। অদ্ভুত উজ্জ্বল আর ধারালো।

আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন?

বাঁচলাম। মহিলা আমায় চিনতে পারেন নি তাহলে। অবশ্য না চেনারই কথা। ওঁর মতো আমারও যৌবন অস্তপ্রায়। প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছি। মহিলার বয়েস আমারই কাছাকাছি। তাছাড়া এতদিন বাদে মুখ মনে রাখাও অসম্ভব। তাই মাথা হেলিয়ে সায় দিলাম যে, কলকাতা থেকেই আসছি।

একটা উপকার করবেন?

বলুন। চেষ্টা করব।

আমার ঘরে যদি দয়া করে আসেন একবার, তাহলে একটা চিঠি আপনার হাতে পাঠিয়ে দেব কলকাতায়।

মহিলার কথায় আমার অবাক হবার পালা। বিশ বছর আগে যে নিজে ইচ্ছে করে আমায় তার আস্তানার ঠিকানা দেয়নি, সে এখন যেচে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চাইছে!

বললাম, চলুন।

সরু গলিপথ দিয়ে খানিকটা হাঁটার পর একটা দোতলা ছিমছাম বাড়ির ওপরের ঘরে এসে পৌঁছলাম। মহিলা ঘরের শিকল খুলে আমায় বসতে বললেন।

বাহুল্য বর্জিত ঘর। একটা নেয়ারের খাটিয়ায় বিছানা। পাশা-পাশি দুটো কুলুঙ্গীতে দুটো ছবি। একটা মা কালীর অপরটা কোট-প্যান্ট টাই পরা সুন্দর চেহারার এক যুবকের। ছবির যুবকটির এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, টানা গভীর দুটি চোখ। মুখে মিষ্টি হাসি যেন ঝুলছে। মুখটা বেশ চেনাচেনা লাগছে। ছবি দুটোর পাশে দুটো করে ব্রহ্মকমল ফুল দিয়ে সাজান। দামী ধূপ জ্বালা হয়েছিল, তারই হাল্কা মিষ্টি গন্ধ ভাসছে ঘরের বাতাসে।

একটু চা খাবেন ?

না, থাক। বেলা হয়ে গেছে। দোকানে গিয়ে দুপুরের খাওয়া একেবারে সেরে নেব।

এখনো খাওয়া হয়নি। ছিঃ ছিঃ, আপনাকে কষ্ট দিলাম।

তাতে কি ? এমন কিছু বেলা হয়নি। হ্যাঁ, চিঠির কথা কি বলছিলেন যেন ?

মহিলা বিছানার নিচ থেকে একটা চিঠি আর কলকাতার একটা ঠিকানা দিয়ে বললেন, এখানে একটা খবর আর এই চিঠিটা দিতে হবে। পোষ্টাপিস খোলা থাকলে ডাকে পাঠাতাম।

কি খবর দিতে হবে বলুন।

বলবেন, আমি এখানেই থাকব এবার। আমার জন্যে যেন তাঁরা চিন্তা না করেন।

বলব। কিন্তু এখানে এই বদরীনারায়ণে থাকবেন কোথায় ? আর ক'দিন বাদেই তো তুষার পড়া শুরু হবে। মানুষ জন কেউ থাকবে না। মন্দিরের দরজাও বন্ধ হয়ে যাবে। দশ-বারো ফুট তুষারের নিচে ঘর-বাড়ি দোকানপাট সবই চাপা পড়ে যাবে। খাবার-দাবার এমন কি জল পর্যন্ত পাবেন না। বাঁচবেন কেমন করে? শীতে এখানে থাকা অসম্ভব।

মহিলা বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, জল জমে যাবে! এই অলকানন্দা নদীও জমে যাবে ? বলেন কি !

শীতে তাই হয়। জল আর জ্বালানীর অভাবের জন্যেই শীতকালে এখানে থাকতে পারে না কেউ ?

তাহলে সাধুসন্ন্যাসীরা থাকেন কেমন করে ?

আগে থেকে তাঁরা কাঠ সংগ্রহ করে রাখেন গুহায়। সারা শীতকাল ধুনি জ্বালিয়ে থাকেন। তাছাড়া যোগ-এর ব্যাপার আছে। শুনেছি অনেক যোগীপুরুষ সারা শীতকাল কুম্ভক করে থাকেন এবং

পানীয় ছাড়াই বেঁচে থাকেন। তাঁদের পক্ষে যা সম্ভব—আমাদের তা কল্পনার অতীত।

মহিলা ভাবছেন গভীর ভাবে।

আমার মনের নিভৃতে বিশ বছর আগের কৌতূহল দানা বাঁধছে আবার। সেদিন যে প্রশ্ন করে কঠিন জবাব পেয়েছিলাম মহিলার কাছ থেকে, সে প্রশ্নটাই মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। সেদিনের বয়সের সঙ্গে আজকের বয়সেই অনেক ফারাক। সেদিনের মানসিকতার সঙ্গে আজকের মানসিকতাও সমান নয়। সেদিন একটি তন্বী যুবতীকে প্রশ্ন করার যে লজ্জা ছিল, আজকের প্রায় প্রৌঢ়াকে প্রশ্ন করার তেমন লজ্জা নেই।

মনের মতো সাধুর দর্শন পেলেন ?

আমার প্রশ্নে মহিলা দারুণ ভাবে চমকে উঠলেন। তারপর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমার মুখে।

এ মুহূর্তে আমি খুবই সাহসী। বহু দিনের প্রশ্ন আর কৌতূহলের মিমাংসা করতেই হবে আজ। একটি সম্পন্ন ঘরের মেয়ে যৌবনকাল থেকে একাকী প্রৌঢ়ত্বের দ্বারে পৌঁছেও সাধু দর্শনের আশায় হিমালয়ের এই দুর্গম স্থানে প্রায় বিশ বছর অপেক্ষা করে কেন ? বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে ওঁকে বলতে শুনেছি, কোন এক মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী, 'তিনি এখানেই দেখা দেবেন। তাঁর দেখা না পাওয়া পর্যন্ত আমি যাব না। তাতে যদি এখানে মরতে হয় আমি মরব।' কে সেই তিনি ? কার জন্য মহিলা মরতেও রাজী আছেন। এ-কি কেবল সাধু দর্শন না আর কিছু ? কোন প্রত্যাশা এই মেয়ের ?

মহিলাকে চুপ করে আমার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে দেখে বললাম, আমায় হয়ত চিনতে পারছেন না। প্রথম যেবার বদরীনারায়ণ আসেন সেবার আমার সঙ্গে আপনি মানা গ্রাম ও ব্যাসগুহায় সৎ সাধুর সন্ধানে গিয়েছিলেন। বেশ কয়েকজন প্রাচীন সাধুর দর্শনও পেয়েছিলেন। কিন্তু আপনি খুশি হননি। তার পরেও

প্রতিবছর এখানে আসেন শুনলাম, তাই ভাবলাম, সত্যিকারের সাধুর দর্শন পেলেন কি-না।

মহিলা স্থির নিশ্চল। যেন পাথর প্রতিমা একটা। সুদূরের কোন অতীতে বুঝি ওঁর মন ভেসে চলেছে। হয়ত সেদিনের কথা মনে পড়েছে। স্বগতোক্তির মতো বললেন, এখনও দেখা পাইনি। তবে সময় হয়েছে এবার।

কার?

সম্বিৎ ফিরে এলো মহিলার মধ্যে। হঠাৎ মুখের রেখা বদলে গেল। উদাস হয়ে যাওয়া দৃষ্টির মধ্যে প্রখরতা বাড়ল। চোখদুটো যেন রাগে কুঁচকে এলো। দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। রূঢ় গলায় বললেন, আপনার এত কৌতূহল কেন সব জানার? মেয়েদের সম্বন্ধে এত কৌতূহল ভাল নয়।

বিশ বছর আগের এক হলুদ অপরাহ্ণে আমার কৌতূহল এমন ভাবেই ধাক্কা খেয়েছিল নির্জন হিমালয়ের উদার প্রান্তরে। সেদিন বয়েস কম ছিল। মনটা ছিল প্রচণ্ড সংবেদনশীল। তাই সেদিন ধাক্কাটা লেগেছিল বেশি। আজও প্রথম চোটে ধাক্কা খেলাম, তবে সামলে নিলাম তাড়াতাড়ি। মৃদু হেসে বললাম, আমার কৌতূহল যদি অপরাধ হয় তাহলে ক্ষমা চাইছি। মেয়েদের সম্বন্ধে পুরুষের কৌতূহল সহজাত। আর আপনার রেগে যাওয়াটাও অন্যায় নয়। তবে বিশ্বাস করুন, আপনার সম্বন্ধে আমার অন্য কোনো কৌতূহল নেই—যেটা পুরুষের সহজাত···

মহিলা আমার কথায় বাধা দিয়ে বললেন, তা যদি না থাকে তবে এত কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

হেসেই বললাম, একসময় আপনাকে নিয়ে সাধুর খোঁজে সারা দিন ঘুরেছি, তাই জিজ্ঞেস করলাম, এই বিশ বছর ধরে কাকে খুঁজছেন। তাছাড়া আপনিই বললেন, সময় হয়েছে তার সঙ্গে দেখা হবার। তিনি কে?

মহিলা রাগে ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন, এটা আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। দয়া করে আপনি মাথা গলাবেন না। খানিক চুপ করে থেকে বললেন, যদি অসুবিধে হয় তাহলে চিঠিটা দিয়ে দিন।

সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার। যা জেনেছি তার বেশি আর কিছু জানার আশা নেই বুঝে বললাম, আমার অসুবিধে কিছু নেই। চিঠি অবশ্যই পৌঁছে দেব। আমার কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না। ভেবেছিলাম বন্ধুর মতো যদি কোনো উপকার করতে পারি। আচ্ছা চলি তাহলে।

মহিলাকে ভাবনার সমুদ্রে ফেলে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

রাতের অন্ধকার সারা অলকানন্দা উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েছে। কার্তিক মাস। নির্মেঘ আকাশ। উত্তুরে বাতাস বইছে একটানা। ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাড়ে কাঁপুনী ধরিয়ে দিচ্ছে। অন্ধ্র ধর্মশালার চৌকিদার ফায়ার প্লেসে কাঠ জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি। মৃদু উষ্ণতায় কম্বল গায়ে চাপিয়ে বসে আছি নেয়ারের খাটিয়ার ওপর। বাইরে অলকানন্দা নদীর একটানা গর্জন ভেসে আসছে।

আজই এ বছরের শেষ সন্ধ্যা-আরতি মনপ্রাণ ভরে দেখলাম। এমন আরতি আগে আর দেখিনি। মহিলাও এসেছিলেন মন্দিরে। চোখাচোখি হয়েছে তবে কথা হয়নি। সন্ধ্যার আরতির ভাবগম্ভীর স্মৃতি মন ভরে রয়েছে এখনো।

পাণ্ডাজী এলেন সন্ধ্যাপ্রদীপ আর নারায়ণের প্রসাদ নিয়ে। বসলেন সামনের চেয়ারে।

ওঁকে সকালের সব ঘটনা এবং চিঠির কথা বললাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, মহিলা যে এখানেই থাকতে চান। কি করবেন ঠিক করলেন ?

পাণ্ডাজী মাথা নেড়ে বললেন, তা হয় না। ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গেই পাঠাব। এখন দেখছি আপনার ওপর ও চটে আছে। আমাকেই

নিয়ে যেতে হবে। জানেন, আমার একটা ধর্মশালা তৈরির প্রায় অর্ধেক টাকাই মেয়েটি দিয়েছে। ও আমার মেয়ের মতো। ওকে এই নির্জন নিঃসঙ্গ বরফের রাজ্যে একা রেখে যেতে পারব না আমি।

পাণ্ডাজীকে জিজ্ঞেস করলাম, মহিলাকে দেখছি আপনি বেশ ভালই চেনেন। বলতে পারেন কেন উনি এত বছর ধরে আসছেন এখানে আর কেনই বা একাকী থাকতে চাইছেন এই নিঃসঙ্গ পুরীতে? কার দেখা পাবার প্রত্যাশা ওঁর? জানেন কিছু?

পাণ্ডাজী প্রথমটা কিন্তু কিন্তু করে শেষে মহিলার সব কথাই বললেন। সুদীর্ঘ সে কাহিনী। আমার এতকালের কৌতূহল যে এভাবে নিবৃত্ত হবে তা কিন্তু আমি একবারও ভাবিনি। মহিলার বেদনাময় কাহিনী আমাকে ব্যাথায় মূক করে দিল। পাণ্ডাজী মহিলার বাপের বাড়ি এবং শ্বশুর বাড়িতে প্রতিবছর যাতায়াত করায় এবং মহিলাকে কন্যারূপে স্নেহ করায় বহু অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সংবাদ পেয়েছেন। সে সব ঘটনা যদিও তিনি পর পর সাজিয়ে বলতে পারেন নি। বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি যথাযথ সাজিয়ে নিয়ে সুদীর্ঘ কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার তৈরি করে নিতে হয়েছে আমায়।

...উত্তর কলকাতার এক বনেদি বংশের বিত্তবান মা-বাবার একমাত্র কন্যা রত্না। স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে সবে মাত্র। ঝাড়া হাত-পা হয়ে আনন্দে উৎসবে মেতেছে, এমন সময় সম্বন্ধ এলো বিয়ের। পাত্র বিমলেন্দু সদ্য বিলেত ফেরত এন্‌জিনীয়ার। নামী কোম্পানীর দামী এন্‌জিনীয়ার। হাজার টাকার ওপর মাইনে। নিজেদের বাড়ি-গাড়ি আর প্রতিপত্তির অভাব নেই। সুদর্শন স্বাস্থ্যবান ছেলে। সুতরাং রত্নার মা-বাবা রাজী হয়ে গেলেন। বিমলেন্দুর সঙ্গে রত্নার বিয়ে হয়ে গেল এক কথায়।

বিয়ের আগে রত্না বিয়ে নামক অনুষ্ঠানটির কথা ভাবার অবসর পায়নি। কারণও ঘটেনি তেমন। তাই বিয়ের আগে বিয়ের

মানসিকতাও তৈরি হয়নি ওর মধ্যে। একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে হঠাৎই যেন বিয়েটা হয়ে গেল ওর।

আনন্দ উৎসবে কয়েক মাস কাটল বেশ। অচেনা মানুষটি সহজেই খুব আপনার হয়ে গেল। বিমলেন্দুর শান্ত মিষ্টি স্বভাব ভাল লাগল রত্নার। ওর শান্ত ভাবের মধ্যে গাম্ভীর্যটা দেখার মতো। স্বামীর গর্বে নিজেকে খুবই গরবিনী মনে করে।

স্বামীর সবই ভাল লাগে, একমাত্র রাত জেগে দর্শনের মোটা মোটা বই পড়া ছাড়া। যে সময় মন চায় স্বামীর বুকে মুখ রেখে আদর খাবার তখন বিমলেন্দু ডুবে থাকে বইয়ের মধ্যে। ডাকলে আসে। না ডাকলে ভুলেই যায় যেন। এই একটাই অস্বস্তি আর অশান্তি রত্নার।

ইদানিং লক্ষ্য করছে বাড়িতে প্রায়ই জটাজুটধারী সাধু-সন্ন্যাসীরা আসেন। বিমলেন্দু ড্রইংরুমে তাঁদের সঙ্গে ধর্মচর্চার গভীরে ডুবে যায়। সে সময় তার সারা মুখে অদ্ভুত এক জ্যোতি যেন খেলা করে। এ নিয়ে রত্না ঠাট্টা করতে ছাড়ে না বিমলেন্দুকে।

বিমলেন্দু সিনেমা থিয়েটার একেবারেই পছন্দ করে না। প্রথম দিকে দু' একটা সিনেমা দেখেছে রত্নার তাগিদে। পরে এড়িয়ে গেছে নানা অজুহাতে। এতেও রত্না তেমন কিছু ভাবেনি। কারণ, এ-বাড়িতে স্বামী ছাড়াই আনন্দ উৎসব করবার সব অধিকার দিয়েছেন ওর শ্বশুর-শাশুড়ী। এমন কি একা বাপের বাড়ি যাওয়া পর্যন্ত।

অস্বস্তি থাকলেও রত্না মানিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। সব সময় জীবনের সব হিসেব মেলে না, এটা বুঝেছিল। কিন্তু প্রথম ধাক্কা খেল এক পিকনিক পার্টির ব্যাপারে। কলেজের পুরনো কয়েকজন বন্ধুর তাগিদে বোটানিকসে পিকনিকের আয়োজন করল রত্না। আগের দিন রাত্রে কথাটা বলল বিমলেন্দুকে। বিমলেন্দুর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

কি হল? পিকনিকের কথা শুনে অমন গম্ভীর হয়ে গেলে যে?

বিমলেন্দু খানিক সংকুচিত হয়ে বলল, আর অন্তত একটা দিন আগে জানলে ভাল হত। কাল এক বিখ্যাত সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করব বলে সব ঠিক হয়ে আছে। ভোর বেলায় বেরতে হবে।

রত্না বলল, কাল দেখা না করলে কি তিনি আর দেখা করবেন না তোমার সঙ্গে? পরে একদিন যেও।

পরে গেলে আর দেখা হবে না। উনি মাত্র আর একদিন আছেন এখানে।

রত্না বলল, কিন্তু পিকনিক তো আর এখন ক্যান্সেল করা যাবে না। এত অল্প সময়ে অতগুলো বন্ধুকে খবর দেওয়া সম্ভব নয়।

বিমলেন্দু শান্ত সুরে বলল, তুমি যাও না।

তার মানে? তুমি যাবে না?

বিমলেন্দু ইতস্তত করে বলল, কথা দিয়েছি কাল দেখা করব। না গেলে খুবই বিশ্রী ব্যাপার হবে।

রত্না অভিমান করে বলল, আমিও তো বন্ধুদের কথা দিয়েছি। আমারটা বুঝি বিশ্রী ব্যাপার হবে না? তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুদের ইনট্রোডিউস্ করার জন্যই এই পিকনিকের ব্যবস্থা করেছি। তুমি না থাকলে পিকনিক করার কোনো মানে হয় না। আমার মান ইজ্জৎ থাকবে না তাহলে।

বিমলেন্দু গভীর চিন্তায় পড়ল। খানিক বাদে বলল, এক কাজ করা যাক, তুমি বন্ধুদের নিয়ে বেরিয়ে পড়। আমি বরং মহাপুরুষকে দর্শন করে সোজা তোমাদের স্পটে মিট করব। এতে দু'জনেরই সত্য রক্ষা হবে।

রত্না ভাবল, এ মন্দের ভাল। তাই রাজি হয়ে গেল।

পরদিন ভোরে বিমলেন্দু সাধু সন্দর্শনে বেরিয়ে পড়ল। রত্না কিছু বাদে গেল বোটানিক্‌সে বন্ধুদের নিয়ে।

বেলা যত বাড়ে রত্না উতলা হয়ে পড়ে ততো। বিমলেন্দুর পাত্তা নেই। বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলে, দেখ তোর কর্তা হয়ত সন্ন্যাসীর পাল্লায়

পড়ে সাধু হয়েই গেল। কত আশা করে এলাম ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করব বলে। তা আর হল না। যাইহোক, সাধুবাবাকে ভালো করে বেঁধে ফেল, না হলে কিন্তু ঠকবি ভাই।

বন্ধুদের ঠাট্টায় কান্না পায় রত্নার।

শেষ পর্যন্ত বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। ক্ষুব্ধ মনে বান্ধবীদের নিয়ে বিমলেন্দুর জন্য অপেক্ষা করে ফিরে এলো। মনে মনে কঠিন প্রতীজ্ঞা করল রত্না বাড়ি ফিরে আজ একটা হেস্তনেস্ত করবেই। এ অপমানের শোধ আজ নেবেই।

বিমলেন্দু যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত গভীর।

রত্না তৈরি হয়েই ছিল। কঠিন দৃষ্টিতে স্বামীর মুখে তাকিয়ে বলল, না ফিরলেই পারতে। বাকি রাতটা সাধু-সঙ্গ করে এলে না কেন?

বিমলেন্দু দুঃখিত। নরম সুরে বলল, তোমার রাগ হওয়া উচিত। একদিকে সত্য রক্ষা করতে গিয়ে আর একদিকে পারলাম না। সত্যি, আমি খুবই লজ্জিত।

থাক, তোমার কাছে কোনো কৈফিয়ৎ চাইনি আমি।

কৈফিয়ৎ নয়। আমি ক্ষমা চাইছি রত্না। তোমার বন্ধুদের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব।

রত্না তীব্র ব্যাঙ্গের সুরে বলল, বাঃ চমৎকার! এত অপমান করেও তোমার আশ মেটেনি। বন্ধুদের কাছে ক্ষমা চেয়ে আমাকে আরও অপমান করতে চাও? বাউণ্ডুলে সন্ন্যাসীগুলোর সঙ্গে মিশে তোমার অনেক উন্নতি হয়েছে দেখছি। সাধু সন্ন্যাসীতে যখন এত টান তখন বিয়ে করতে গেলে কেন? আমার জীবনটা নষ্ট করার কি অধিকার আছে তোমার!

রত্নার মুখে রক্ত নেমে আসে। রাগে ফুলছে। কাঁপছে।

বিমলেন্দু গম্ভীর হয়ে গেল। রত্নার দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে বলল, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েছি, ক্ষমার যোগ্য হলে ক্ষমা

করো। তোমার কথাই ঠিক। বিয়ে আমার করা উচিত হয়নি। করেছি কেবল মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে।

রত্না আবার যেন ঝলসে উঠল। বলল, কথাটা আর কাউকে বলো না। লোকে শুনলে ছিঃ ছিঃ করবে। মা'র জন্যে বিয়ে করেছ কথাটা বলতে লজ্জা করছে না তোমার?

বিমলেন্দু আর কথা বাড়ায়নি। তর্কাতর্কি কোনো দিনই পছন্দ করে না। আর এ ক্ষেত্রে কথা বাড়ানো যে উচিত নয় তা বুঝতে পারছে ভালই।

সে রাতটা রত্না চোখ বোজাতে পারেনি। পাশ বালিশ আঁকড়ে ধরে নির্জীবের মতো পড়েছিল বিছানায়। বিমলেন্দু যদি ঝগড়া করত তাহলে হাল্কা হতে পারত রত্না। সারাদিনের চাপা অসন্তোষ আর জ্বালা কমে যেত। কিন্তু মানুষটি যে অমন ভাবে নিজের মধ্যে গুটিয়ে যাবে তা ভাবতে পারেনি। আরো আশ্চর্য হয়েছে, এত ঘটনার পরও কি করে ওরই পাশে নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে পড়তে পারল! বিমলেন্দুকে বড় বেশি হৃদয়হীন বলে মনে হয়েছে। এমন মানুষের সঙ্গে সারা জীবন ঘর করতে হবে? মা বাবা শ্বশুর-শাশুড়ীর ওপর রাগ হয়েছে ওর। সবাই যেন জোর করে ওর সুখ কেড়ে নেবার চক্রান্ত করেছে। অভিমানে দুঃখে চোখের পাতা বারবার ভিজে উঠেছে। সে রাতেই সংকল্প করেছে, বিমলেন্দুকে শিক্ষা দিতে হবে। প্রতিশোধ নিতে হবে এই অপমানের।

পরদিন সকালেই রত্না বাপের বাড়ি চলে এসেছে। এমন ও প্রায়ই যায়, তাই কেউ জানতেও পারেনি ওদের মনের খবর। বেরিয়ে আসার সময় কেবল বিমলেন্দু রত্নার হাত দু'টি ধরে বলেছিল, আমায় ভুল বুঝো না রত্না। সাধু-সন্ন্যাসীদের আমি শ্রদ্ধা ভক্তি করি কিন্তু তোমায় আমি ভালবাসি।

রত্নার বুকের নিচে তখন প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে। বিমলেন্দুর কথাগুলো ব্যাঙ্গের মতো মনে হয়েছে ওর। রূঢ় গলায় বলেছে,

ভণ্ডামী ছাড়। তোমাকে আমার জানা হয়ে গেছে। তুমি তোমার সন্ন্যাসীদের নিয়ে ঘর করো।

তবু শেষবারের মতো ঘরের দরজা আগলে জিজ্ঞেস করল বিমলেন্দু, এটাই কি তোমার শেষ কথা রত্না ?

রত্না ঝংকার দিয়ে বলল, হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ……

বিমলেন্দু আর বাধা দেয়নি।

এরপর সাতটা দিনও যায়নি। হঠাৎ একদিন শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক এসে হাজির। বিমলেন্দুকে কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। যথারীতি অফিস গেছল। তারপর আর বাড়ি ফেরেনি। অফিস পুলিশ, হাসপাতাল সর্বত্রই খোঁজ-খবর নেওয়া হয়ে গেছে। কোথাও কোনো খবর নেই। মা অন্নজল ত্যাগ করেছেন।

ঘটনা শুনে রত্না স্তম্ভিত !

এক কাপড়ে শ্বশুরবাড়িতে এসে হাজির হল।

রত্নাকে দেখে শাশুড়ী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিছু জান বৌমা ?

কি জানে আর কতটুকুই বা জানে রত্না। যতটুকু ঘটনা ঘটেছে তাতে গৃহ ত্যাগ করার মতো কিছুই হয়নি। রত্না শান্ত ভাবে বলল, আমি কিছু জানি না মা। আপনার ছেলে আমাকে কিছুই বলে যান নি।

কোনো তীর্থটির্থের কথা বলেছে কিছু ?

কই না তো।

শাশুড়ী আনমনে বলেন, ছেলের সাধু-সন্ন্যাসীতে বড় টান ছোট-বেলা থেকে। কোথাও সাধু এসেছে শুনলেই ছুটবে সবার আগে। মনে মনে ভয় পেয়ে গেলাম। ছেলের ভাব-গতিক দেখে শেষে বিলেত পাঠালাম ওকে। ভাবলাম, ও-সব দেশে তো আর আমাদের মতো গাদা গাদা সাধু নেই, ছেলের মনের পরিবর্তন হবে। কিন্তু বদলাল না। বরং আরো বেশি সাধু হয়ে ফিরল ছেলে। কি সব

বড় বড় বই পড়ে। সাধু-সন্ন্যাসীদের নিয়ে আসে বাড়িতে। দেখে আরো ভয় পেলাম। ভাবলাম বিয়ে দিলে ছেলে সংসারী হবে। বউ পেলে আর সাধু-সন্ন্যাসীতে আর্কষণ থাকবে না। বিয়েও দিলাম কিন্তু তাকে তো ধরে রাখতে পারলে না বৌমা?

শাশুড়ীর কথায় মনের জ্বালা আরো বাড়ল। সব জেনে শুনে ছেলের বিয়ে দিয়ে এখন তাকেই দোষ দিচ্ছে! কঠিন কথা মুখে এসে গেছল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল রত্না।

শাশুড়ী আবার বললেন, ছেলের সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ করা দেখেও তাকে আটকালে না কেন মা?

রত্না আর নিজেকে সামলাতে পারল না। বলে ফেলল, আটকানো আপনাদের উচিত ছিল। ছেলে সাধু হবে জেনেও কেন আমার এই ক্ষতি করলেন?

শাশুড়ী হতবাক! রত্নার কাছে এমন অভিযোগ অস্বাভাবিক না হলেও আশাতীত। তিনি শান্ত গলায় বললেন, বৌমা, আমার অপরাধ মানছি। কিন্তু মেয়ে হয়ে তুমি মেয়েদের মর্যাদা রাখতে পারনি। তোমার রূপ আছে, কিন্তু রূপ দিয়ে যদি একটা পুরুষ মানুষকে বশ করতে না পারলে তাহলে মেয়েমানুষের জন্মই বৃথা।

রত্না স্তব্ধ! এ কথার পর আর মুখে উত্তর যোগায় নি।

পরের দিন বাপের বাড়ি থেকে একটা চিঠি এলো রত্নার নামে। খামের ওপর হাতের লেখাটা পড়ে বুক দুরু দুরু করে উঠল। খাম খুলে দেখে বিমলেন্দুরই চিঠি। মাত্র ক'য়েক ছত্র লেখা। সামান্য কটা লাইন অথচ কত তাৎপর্যপূর্ণ।

বিমলেন্দু লিখেছে, সন্ন্যাসের প্রতি আমার আকর্ষণ বাল্যকাল থেকেই। সাধুসঙ্গ আমার প্রিয়। মনে একান্ত বাসনা ছিল হিমালয়ের গহনে বসে আমার আমিত্বকে চেনার সাধনা করব। এতদিন পারিনি কেবল মায়ের মুখ চেয়ে। মনের অন্তস্থলে বাসনটা ছিলই। তারপর তুমি এলে আমার জীবনে। অন্তস্থলের বাসনা আমার ভেঙ্গে

গেল। সন্ন্যাসী হবার বাসনা আর স্বপ্ন দেখা ছাড়লাম। সংসারে থেকে সাধুসঙ্গ করে কাটাব বলে যখন মন স্থির করছি, তখন তুমিই আমায় অভীষ্টের দিকে ঠেলে দিলে। এটাই বুঝি ভবিতব্য। তোমার কাছে আমি সত্যি কৃতজ্ঞ। আমায় ক্ষমা করো।

বিমলেন্দুর চিঠি পড়তে পড়তে চোখ ঝাপসা হয়ে গেল রত্নার। তারপর ঝরঝর করে অশ্রু ঝরে পড়ল চোখ বেয়ে।

সারা রাত কতবার চিঠিটা পড়ল তার হিসেব নেই। বার বার বিমলেন্দুর মুখ ভেসে উঠছে চোখের সামনে। শেষ দিনটার স্মৃতি বড় বেদনাময়। কত করুণভাবে ওর হাত চেপে ধরে শেষ অনুরোধ করেছিল। বুঝতে পারেনি রত্না সামান্য একটা ঘটনায় এত বড় বিপর্যয় ঘটে যাবে।

শাশুড়ীর কথা মনে পড়ছে। রূপ থাকতেও নারীর মর্যাদা রাখতে পারেনি রত্না। এটা কি ওর পরাজয়? নারীত্বের পরাজয়! না—না এ হতে পারে না। রত্না পরাজয় স্বীকার করবে না। শেষে সংকল্প করল যেকোনও উপায়ে বিমলেন্দুকে ফিরিয়ে আনবে সন্ন্যাসের পথ থেকে।

দিন মাস বছর গড়িয়ে গেল। কোনো সংবাদ নেই বিমলেন্দুর।

রত্না বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে খোঁজ খবর করে। নিজে ঘুরে বেড়ায় কলকাতার বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটে, মন্দিরে আর আশ্রমে। মাঝে মাঝে খবর এলে ছুটে যায় গ্রামে। কয়েকবার বেনারস, কাশী ও হরিদ্বার ঘুরে এসেছে। কিন্তু কোনো হদিশ পায়নি। আত্মীয়-বন্ধুরা ওর এই অনিশ্চিত সন্ধান করে বেড়ানোর ব্যাপারটা পছন্দ করেনি। কেউ কেউ আপত্তিও করেছে। শোনেনি রত্না।

একদিন খবর এলো বিমলেন্দুর অফিসের কিছু কর্মীর কাছ থেকে। তারা নাকি বিমলেন্দুকে বদরীনারায়ণে দেখেছে।

বিমলেন্দু সন্ন্যাস নিয়েছে খবর পেয়েই রত্না চলে আসে বদরীনারায়ণে এক দেওরকে নিয়ে। ওঠে পাণ্ডাজীর বাড়িতে। বেশ

ক'য়েক মাস পাণ্ডাজীর কাছে থেকে সাধু সন্ন্যাসীদের আস্তানায় খোঁজ খবর করে। কিন্তু বিমলেন্দুর কোনো হদিশ পায়নি। এরপর প্রতি বছর নিয়মিত আসে আর অপেক্ষা করে এখানে। নতুন সাধুর খোঁজ পেলেই ছুটে যায়।...

পাণ্ডাজীর কথা শেষ হতেই প্রশ্ন করি, বিমলেন্দুবাবুর দেখা পেয়েছেন কি উনি?

পাণ্ডাজী মাথা দুলিয়ে বলেন, না, এখনো পায়নি।

তবে সকালে যে রত্নাদেবী বলছিলেন, সময় হয়েছে। দেখা না পেলে সময় হয়েছে জানলেন কেমন করে?

পাণ্ডাজী বললেন, ও কথা এক মাহাত্মা বলেছেন ওকে। বেটি স্বামীর দেখা না পেলেও অনেক মহাত্মার দর্শন পেয়েছে। এক মহাত্মা বলেছেন, ওর স্বামী বিশ বছর পূর্ণ হলেই তবে সংসারে ফিরবেন। তিনি বহাল তবিয়তে আছেন। বর্তমানে তিনি নাকি পারিব্রজ্য নিয়ে ভারতের নানা তীর্থে ভ্রমণ করছেন। সবশেষে এই বদরীনারায়ণেই আসবেন।

বিশ বছর কি পূর্ণ হল পাণ্ডাজী?

হ্যাঁ, এটাই শেষ বছর।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে কিছু দেরি হল।

এখন ঘরে ফেরার সময় তাই তেমন তাড়া নেই। ধীরেসুস্থে ফিরলেই চলবে। টানা একটা মাস পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বিশ্রাম দরকার। অন্ধ্র ধর্মশালার নির্জনতায় বিশ্রামের অখণ্ড সুযোগ।

বদরীনারায়ণ মন্দিরে ভোগ-আরতি শুরু হয়ে গেছে।

শেষবারের মতো দর্শনের আশায় তাড়াতাড়ি স্নান সারতে গিয়ে দেখলাম কয়েকজন সৌম্যদর্শন সাধু ছাড়া যাত্রী আমি একাই।

দু'জন সাধুর স্নান হয়ে গেছে। তাঁরা কৌপিন পরা অবস্থায় সূর্যের দিকে চেয়ে সূর্য বন্দনা করছেন। বাকিরা ব্রহ্মকুণ্ডের উষ্ণ জলে অবগাহণ স্নান করছেন।

চটপট কয়েকটা ডুব দিয়ে উঠে এলাম। ভোগ-আরতির কাঁসর-ঘণ্টা, কাড়া-নাকাড়া বাজছে মন্দিরে। আরতির পরই মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে ছ'মাসের জন্য।

আজও দর্শন হল বড় ভাল।

পূজারীরা বদরীনারায়ণজীর গর্ভগৃহের দরজা বন্ধ করার আগের মুহূর্তটি পর্যন্ত দর্শন করলাম। প্রার্থনা করলাম কত কি।

ধর্মশালায় ফিরে ঝোলা গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে। সকালের বাসে যেতে না পারলে আজ আর শ্রীনগর পৌঁছনো যাবে না। কেদার-বদরীর পথে থাকার মতো বিশেষ করে রাত কাটাবার সবচেয়ে ভাল জায়গা শ্রীনগর এবং যোশীমঠ। পথে রাত কাটাতে হলে আমি এ দুটি জায়গা বিশেষ ভাবে পছন্দ করি। শহর দুটি যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তেমনই এখানে ভাল ধর্মশালা, রেষ্টহাউস ও হোটেল আছে।

পোষ্টাপিসকে পাশ কাটিয়ে অলকানন্দার ওপর সেতু পার হবার সময় মনে পড়ল রত্নাদেবীর কথা। মহিলা কোথায়? সকালে মন্দিরে দেখিনি। এখানেও নেই। তবে কি ধর্মশালায় রয়েছেন। অদ্ভুত সাধনা ভদ্রমহিলার। এমন ধৈর্য ধরে বিশ বছর অরূপরতনের অন্বেষণ অভাবিত ব্যাপার। জানিনা ক'জন মেয়ে এমনভাবে অপেক্ষা করতে পারে। অহল্যার কাহিনী শুনেছি। রত্নাদেবী কি অহল্যার মতো তার সাধনার ধনকে ফিরে পাবে?

বাসস্ট্যাণ্ডে এসে দেখি মাত্র তিনটি বাস দাঁড়িয়ে। যাত্রার জন্য প্রস্তুত।

বুকিং অফিসে খোঁজ নিয়ে জানলাম, একটিও সিট খালি নেই।

আগের থেকে সব সিট বুক হয়ে আছে। যাত্রীরাও মালপত্র নিয়ে যে যার সিটে বসে গেছে।

আজ আর কোনো বাস আসবে না নিচ থেকে। কাল সকালে তিনটে বাস আসবে যোশীমঠ থেকে। তাতেই সব যাত্রীকে নিয়ে নেবে যাবে ঋষীকেশ। তারপর বদরীক্ষেত্র হবে পরিত্যক্ত ছয় মাসের জন্য।

সাময়িক মনটা খারাপ হয়ে গেলেও হিমালয়ে হিসেবের বাড়তি একটা দিন এবং বিশেষ করে বদরীনারায়ণজীর সান্নিধ্যে থাকার কথা চিন্তা করে খুশিই হলাম।

বাস ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে পাণ্ডাজীর সঙ্গে এলেন রত্নাদেবী। ফিরে যাচ্ছেন তাহলে মহিলা! কিছুটা অবাকই হলাম। এ নিশ্চয় পাণ্ডাজীর কৃতিত্ব। কাল যা শুনেছি তাতে তো মনে হয়েছিল ফ্যাসাদ বাঁধাবেন মহিলা। ভালই হল। এই নিঃসঙ্গপুরীতে একাকী তুষারের রাজ্যে থাকার অর্থ আত্মহত্যা।

চোখাচোখি হতে রত্নাদেবী সিধে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আয়ত দীঘল চোখদুটি ওঁর অনিদ্রায় দুশ্চিন্তায় বসে গেছে। সজল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আর খবর দেবার দরকার নেই। আমি ফিরে যাচ্ছি। কাল আপনাকে অনেক কঠিন কথা বলেছি। কিছু মনে করবেন না।

না না, আমি কিছু মনে করিনি। ফিরে গিয়ে ভাল করছেন। শীতে এখানে কেউ থাকে না। বরং আবার সামনের বছর আসবেন মন্দির খুললে।

রত্নাদেবী বদরীনারায়ণ মন্দিরের দিকে তাকিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন। বিবর্ণ শালের খুঁট মুখে চেপে কান্না থামাবার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, আর কখনো আসব না—কখনো না। ওই পাথরের দেবতার প্রাণ নেই, হৃদয় নেই। বিশ বছর ধরে ওর পায়ে কত চোখের জল ফেলেছি, কত প্রার্থনা জানিয়েছি, তবু আমার

কথা ওর কানে যায়নি যখন—আমি আর কি জন্যে আসব বলতে পারেন ?—না না না, কখনো আসব না আর। কখনো না…

কথা শেষ হবার আগে তিনটে বাস একসঙ্গে ইলেট্রিক হর্ন বাজিয়ে শুভযাত্রার নির্দেশ দিল। শব্দ তরঙ্গে হারিয়ে গেল রত্নাদেবীর শেষ কথাগুলো।

ধুলোর কুণ্ডলী তুলে পর পর তিনটে বাস আঁকা বাঁকা পথে সর্পিল গতিতে যাত্রা শুরু করল। দূর থেকে যাত্রীদের সমবেত কণ্ঠের জয়ধ্বনি ভেসে এলো, বদরী বিশাল কী জয়…

ঝোলা নিয়ে ফিরে এসেছি ধর্মশালায়। চৌকিদারকে দিয়ে ঘরের দরজা খুলিয়ে মন্দিরের দিকের একটা ঘরে উঠেছি। আগের ঘরটা দখল করেছে ব্রহ্মকুণ্ডে দেখা সেই সাধুর দল। এ দুটো ঘর পাপাপাশি। মাঝে কেবল একটা কাঠের পার্টিশান। ও ঘরের কথা শোনা যায় এ ঘরে।

মন্দির বন্ধ হয়ে গেলেও এখনো তালা পড়েনি। ছ'মাস নারায়ণ একাকী থাকবেন। তাঁর এই নির্জন বাস যাতে সুখের হয়, যাতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে তার আয়োজন করছেন স্বয়ং রাওলজী অন্যান্য পূজারীর সহযোগিতায়।

আজ সারাদিন থাকতে হবে বদরীনারায়ণে, কিন্তু দর্শন হবে না। শুনলাম, একমাত্র সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য বিশেষ দর্শনের ব্যবস্থা হবে সন্ধ্যায়। তখন বিশেষ আরতিও হবে। সেই আরতি দেখার অধিকার কেবল সাধু-সন্তের। আরতির পর গর্ভগৃহ এবং মন্দিরের সিংহ দরজায় তালা পড়বে। খোলা হবে ছ'মাস পরে নির্দিষ্ট দিনে।

ঘরের দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বদরীনারায়ণ মন্দিরের সিংহ-দরজা আধভেজান। একটিও দর্শনার্থী নেই সেখানে।

এগিয়ে চললাম বাজারের পথে। নিস্তব্ধ নিঝুম সব। সারি সারি দোকানপাট সবই বন্ধ। বড় বড় তালা ঝুলছে বন্ধ দরজায়। বাজারের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এসে থমকালাম। একটিও দোকান খোলা নেই। একটিও মানুষের চিহ্ন নেই। এমন কি পথের ধারে ঘুরে বেড়ানো বড় বড় তিব্বতী কুকুরও নেই একটাও। বাসের যাত্রীদের সঙ্গে তারাও বুঝি বদরীনারায়ণ উপত্যকা পরিত্যাগ করে চলে গেছে নিশ্চিত আশ্রয়ের দিকে।

এতবার বদরীনারায়ণে এসেছি কিন্তু এমন রিক্ত শূন্য দৃশ্য আগে আর দেখিনি কখনো।

ভাবনায় পড়লাম।

একটা দিন থাকতে হবে এখানে। কিন্তু খাব কি?

একাকী মানুষ। খাবার-দাবার তাই সঙ্গে বয়ে নিয়ে বেড়াই না। হিমালয়ের যেখানে যা পাই তাই দিয়ে উদরপূর্তি করে নিই।

সবই বন্ধ হয়ে গেছে। মানুষের চিহ্ন নেই। খাওয়া জুটবে কোথায়? এই প্রচণ্ড শীতে অভুক্ত থাকা সম্ভব নয়। অথচ অলকানন্দা নদীর জল ছাড়া আর কিছুই তো নজরে পড়ে না। জল দিয়েই উদরপূর্তি করতে হবে নাকি!

বাজারের পথ ছেড়ে ধর্মশালা আর পাণ্ডাদের পাড়ায় প্রবেশ করলাম। একই চেহারা। দরজা জানলা বন্ধ। দরজায় তালা ঝুলছে। নিস্তব্ধ নিঝুম সব।

দেখে মনেই হয় না যে দু' দিন আগেও এই পাণ্ডাদের বাড়িগুলো মানুষের ভীড়ে জমজমাট ছিল।

ঘুরতে ঘুরতে সাধুদের গুহা ও ঝোপড়ার কাছে এসে পড়লাম।

সব গুহা সব ঝোপড়া পরিত্যক্ত। একটিও সাধু নেই এখানে। গতকালই ক'য়েকজনকে দেখেছি গায়ে হোমের বিভূতি মেখে গুহায়-ঝোপড়ায় বসে থাকতে। এ-সব সাধু নিশ্চয় আজকের বাসের যাত্রী হয়ে ঋষীকেশ অথবা হরিদ্বারে চলে গেছেন।

এঁরা মরসুমী সাধু। যাত্রীদের আসার আগে এখানে এসে আসন পাতেন, যাত্রীদের যাত্রা শেষে আসন গুটিয়ে নিয়ে নেমে যান নিচে। এঁদেরই রত্নাদেবী বলেছিলেন ভিখিরী সাধু।

বিশ বছর আগে রত্নাদেবীর 'ভিখিরী সাধু' মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলাম। পরে হিমালয়ের পথে প্রান্তে ভ্রমণ করার সময় তাঁর মন্তব্যের যথাযথ প্রমাণ পেয়েছি। অনেক সাধুকে জিজ্ঞেস করেছি, কেন এ-পথে তাঁরা এসেছেন। জবাব পেয়েছি, ঘরে অভাব, অনেক-গুলো ভাই-বোনকে মা-বাবা দু' বেলা দু' মুঠো ভাত বা রুটি দিতে পারে না। পেটের ক্ষিদেয় পথে বেরিয়ে শেষে সাধু হয়েছে। সাধুর ভেক নিলে অভাব হয় না এ-দেশে। সরল বাস্তব উক্তি।

এ কারণে তীর্থের পথে আর মেলায় এদের ঘুরে বেড়াতে হয়।

ভাবনা বাড়ছে। হিমালয়ের দুর্গমে—গহনে নির্জনে দিনের পর দিন ঘুরেছি। ভাবনা হয়নি তাতে। কারণ রসদ ছিল সঙ্গে। কিন্তু এই নিঃসঙ্গপুরীতে বিনা রসদে একটা দিন কাটানো ভাবনার কথাই।

নিজের কুড়েমির জন্য নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে। ভোরে উঠতে পারলে বাসে একটা সিট অবশ্যই পাওয়া যেত। আর তাহলে আজই নিশ্চত আশ্রয়ে পৌঁছতে পারতাম। এখন একমাত্র ভরসা ধর্মশালার চৌকিদার। ওর কাছে নিশ্চয় কিছু খাবার পাওয়া যাবে।

ব্রহ্মকপালীর কাছে এসে থমকালাম।

নিচে অলকানন্দার তীর থেকে উদাত্ত কণ্ঠের গায়ত্রী মন্ত্র ভেসে আসছে—

ওঁ আয়াহি বরদে দেবী
ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী
গায়ত্রীছন্দসাং মাতঃ
ব্রহ্মযোনী নমোঽস্তুতে।...

স্বর্গীয় সংগীতের সুরে গায়ত্রীর অপূর্ব মাতৃ আবাহন দেবতাত্মা হিমালয়ের আকাশে বাতাসে দেবীর আবির্ভাব ঘোষণা করছে যেন।

ব্রহ্মকপালীর বাঁধানো চত্বরে আটজন সাধু সমবেত হোম-পূজা করছেন। ওঁদের সকালে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতে দেখেছি।

একজন সাধু মুণ্ডিত মস্তক। বাকি সাতজন দীর্ঘ জটাজুট। ছ'জন হোম করছেন। একজন করছেন হোমের তদারকী। সেই সাধু দলের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ বলে মনে হল। মুণ্ডিত মস্তক সাধু হোমের আগুনের সামনে ধ্যানস্থ। বাকি ছ'জনও।

নিঃসঙ্গ নির্জন বদরীনারায়ণের ব্রহ্মকপালীতেই যেন প্রাণের স্পর্শ অনুভব করলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম খানিক। দাঁড়ালাম কিছুটা তফাতে। তদারককারী বয়স্ক সাধুর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল। সপ্রশ্ন খানিক তাকিয়ে থেকে যেন মৃদু হাসলেন তিনি। অভয় বোধ করলাম।

মাতৃ আবাহন শেষে ধ্যানস্থ হয়েছেন সন্ন্যাসীরা। হোমের আগুন জ্বলছে। তদারককারী সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে হব্য অর্থাৎ বেল কাঠ এবং ঘি দিচ্ছেন হোমের আগুনে।

অসীম নিস্তব্ধতা।

অলকানন্দা নদীর একটানা কল্‌কল্‌ ছল্‌ছল্‌ শব্দ ছাড়া প্রাণের আর কোনো স্পন্দন নেই যেন।

ধ্যানস্থ সন্ন্যাসীদের স্থির নিশ্চল শরীর থেকে অপূর্ব জ্যোতির আভায় যেন ব্রহ্মকপালী উদ্ভাসিত।

কতক্ষণ এভাবে কেটেছে জানি না।

ওঁদের মতো আমিও যেন ধ্যানস্থ হয়ে পড়েছি।

বার বার মনে পড়ছে রত্নাদেবীর কথা। মহিলা এ মুহূর্তে বদরীনারায়ণে থাকলে ছুটে আসতেন এখানে। সন্ধানী দৃষ্টিতে খুঁজতেন তাঁর অরূপ রতনকে। পেতেন কি-না, জানি না। হয়ত হতাশ হতেন। বিশ বছর ধরেই হতাশ হয়েছেন। কিন্তু অদ্ভুত আশা নিয়ে আবার অন্বেষণ করেছেন। বিশ বছরের ধৈর্যে মাঝে মাঝেই ফাটল ধরেছে—কিন্তু ধ্বস নামেনি। ধ্বস নামল এবার। যে

মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী সম্বল করে আশায় বুক বেঁধে ছিল, সেই আশার বাঁধেই শেষে অজস্র ফাটল দেখা দিল। তাই ধ্বস নামাটা অস্বাভাবিক নয়।

রত্নাদেবীর শেষ কথাগুলো যেন বাজছে কানের পাশে—যে দেবতার চরণে বিশ বছর ধরে চোখের জল ফেললাম, তার কানে যখন আমার নিবেদন যায়নি তখন সেই হৃদয়হীন দেবতার কাছে আবার আসব কেন বলতে পারেন?

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে সমবেত কণ্ঠে আবার উচ্চারিত হল গায়ত্রী মন্ত্র।

…ওঁ ভূঃ ওঁ ভূবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং

ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়য়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

ওঁ আপোজ্যোতিঃ রসোহমৃতং ব্রহ্মণে স্বাহা।…

গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে হোমকুণ্ডে ঘৃতাহুতি দিচ্ছেন সন্ন্যাসীরা। নিভু নিভু হোমের আগুন লক লক করে উঠছে ওপরে।

আহুতি শেষে আবার ধ্যান। সাতটি মূর্তি প্রস্তরবৎ। এমন দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয় না সবার। রত্নাদেবীর কথা মনে পড়ল আবার। এ দৃশ্য তাঁর ভাল লাগত নিশ্চয়।

ধ্যান শেষ হল। এবার পূর্ণাহুতি।

সাম গানের সুরে উচ্চারিত হল পূর্ণাহুতির মন্ত্র। সন্ন্যাসীরা বড় এক পাত্র থেকে কুশিতে করে ঘি তুলে পূর্ণাহুতি দেওয়া শুরু করলেন।

ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ

ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মাণহুতম্

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং

ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা স্বাহা।

হোমের শেষে মুণ্ডিত মস্তক যুবা সন্ন্যাসীকে সবাই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। তিনিও সবাইকে করজোড়ে প্রণাম জানালেন। তারপর সদ্য কামানো মাথার জটার কিছু অংশ সন্ন্যাসীরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে বাকি অংশ দিলেন সেই সন্ন্যাসীর হাতে। যুবা সন্ন্যাসী

তাঁর মাথার জটা এবং দণ্ডি নিয়ে নেমে গেলেন অলকানন্দায়। এক হাঁটু হিমশীতল জলে দাঁড়িয়ে বিসর্জন দিলেন সেসব অলকানন্দা নদীর পবিত্র জলধারায়।

স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখছি।

বয়স্ক সন্ন্যাসী ইতিমধ্যে আমার সামনে এসে প্রশ্ন করলেন, আপ ?

নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, যাত্রী।

আজ তো কোনো যাত্রী আসেনি! কবে এসেছ ?

গতকাল সকালে।

কিন্তু, আজ তো মন্দির বন্ধ হয়ে গেছে। সবাই চলে গেছে।

হ্যাঁ। আমিও যেতাম। বাসে জায়গা পাইনি তাই থাকতে হল। কাল যাব।

একা থাকবে কেমন করে ? সন্ন্যাসীর বিস্ময় ভরা প্রশ্ন।

হেসে বললাম, উপায় কি ?

কোথায় উঠেছ ?

আপনাদের পাশের ঘরেই আছি।

সন্ন্যাসী যেন খুশি হলেন। বললেন, তাহলে তো ভালই হয়েছে। আমরাও কাল নেমে যাব এখান থেকে।

খানিক কি ভেবে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ঘর কোথায় ?

বললাম, কলকাতা।

খুশি যেন চিকিয়ে উঠল মহাত্মার সরল মুখে। সঙ্গীদের দিকে তাকালেন। কি যেন বলতে গিয়েও চেপে গেলেন।

হোমাগ্নি নেভান হয়ে গেছে। ঝোলাঝুলি নিয়ে সাধুরা উঠে এলেন ওপরে। আমাকে অনেক আগেই তাঁদের দেখা হয়ে গেছে। ওপরে আসতেই করজোড়ে প্রণাম জানালাম। সন্ন্যাসীরা আশীর্বাদের মুদ্রায় "নমঃ নারায়ণঃ" বলে স্বর্গীয় মৃদু হাসলেন।

ওঁরা সারিবদ্ধ চলেছেন মন্দিরের দিকে। আমি ওঁদের পিছনে।

মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে ওঁরা উঠলেন। দরজায় টোকা দিতেই

বদরীনারায়ণের কাঠের বিরাট সিংহ-দরজা খুলে গেল। সন্ন্যাসীরা একে একে প্রবেশ করলেন মন্দিরে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সন্ন্যাসীদের জন্য বিশেষ দেব-দর্শনের ব্যাবস্থা হয় এমন ভাবেই।

ফিরে এলাম অন্ধ্র ধর্মশালায় নিজের ছোট্ট ঘরটায়।

নভেম্বরের মাঝামাঝি। দিনের অংশ কমে গিয়ে রাত বড় হয়েছে। সাঁড়ে পাঁচটার মধ্যেই অন্ধকার নেমেছে উপত্যকায়। অন্য সময় সাড়ে সাতটায় অন্ধকার নামে। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে হিম প্রবাহ বইতে শুরু করে। একটানা কনকনে উত্তুরে বাতাস হাড়ে চিমটি কাটে যেন।

ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে গায়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে নেয়ারের খাটে পা মুড়ে বসে আছি। চৌকিদার ফায়ার প্লেসে কাঠ জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। হাল্কা উত্তাপ বেশ ভালই লাগছে।

ভাগ্যটা সত্যই এবার প্রসন্ন আমার। সকালে খাবারের চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। খাবার জুটেছে আমার আশ্চর্যভাবে।

সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে আজ ভোগ পেয়েছি। সে ভোগ বদরী-নারায়ণের। সন্ন্যাসীদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি। সন্ন্যাসীমণ্ডলীর প্রধান স্বামী আত্মানন্দ, যিনি সকালে যেচে আলাপ করেছিলেন আমার সঙ্গে, তিনি দুপুরে নিজের হাতে ভোগ পৌঁছে দিয়ে গেছেন ঘরে। এ আমার পরম সৌভাগ্য। এর সঙ্গে আর একটু সৌভাগ্যের যোগ হয়েছে। আগামীকাল এক সঙ্গে এক বাসে আমি ফিরব ওঁদের সঙ্গে হৃষীকেশ। এমন সাধুসঙ্গ আমার কল্পনার অতীত ছিল।

ঘরের দরজায় টোকা পড়ল।

বললাম, অন্দর আইয়ে।

দরজা ঠেলে মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসী ঢুকলেন ঘরে।

অবাক হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এঁকে দেখেছি কিন্তু আলাপ হয়নি। এখন কোন কাজে আমারই ঘরে এসে উপস্থিত।

আমাকে দাঁড়াতে দেখে সন্ন্যাসী মিষ্টি হেসে পরিষ্কার বাঙলায় বললেন, বসুন বসুন।

বিস্ময়ের অন্ত নেই আমার। মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, আপনি বাঙালী!

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন আমার সামনে।

পাতলা একটা কম্বল ওঁর গায়ে। পরনে সাদা থানের দু'পাট করা লুঙ্গি। পায়ে খড়ম। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কিন্তু ওঁর শরীরে কোনো কাঁপন নেই!

সন্ন্যাসীর নামটি সকালেই শুনেছি স্বামী আত্মানন্দের কাছে।

ইনি স্বামী জ্ঞানানন্দ মহারাজ। সকালেই ওঁর জটা শংকর হয়েছে। হোম-পূজা ওঁকে নিয়েই। আরও জানার কৌতূহল ছিল কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারিনি। সন্ন্যাসীদের ঘাঁটাতে ভাললাগে না। কারণ, যা বুঝি না তাতে কৌতূহল থাকলেও ওঁদের বিব্রত করতে ইচ্ছে হয় না আমার।

আপনি স্বামী জ্ঞানানন্দ?

প্রশ্নের উত্তর হেসে দিলেন সন্ন্যাসী। আমার মুখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ি কোথায়?

বললাম, কলকাতা।

কলকাতার কোথায়?

টালীগঞ্জ।

হিমালয়ে ঘোরেন খুব, তাই না?

হাসলাম।

কেমন লাগে হিমালয়?

এবার সরাসরি জবাব না দিয়ে বললাম, আপনিও তো হিমালয়ে ঘুরছেন, আপনার কেমন লাগে?

হেসে ফেললেন জ্ঞানানন্দ মহারাজ। বললেন, আমরা সন্ন্যাসী,

হিমালয় আমাদের কাছে পরম প্রেয় এবং শ্রেয়। আপনি গৃহী, হিমালয়ে ঘোরেন। আপনার কেমন লাগে তাই জিজ্ঞেস করছি।

ভাললাগে বলেই তো আসি বার বার। আকাশে মেঘ জমলে সে দিকে তাকিয়ে আমার হিমালয়ের কথা মনে পড়ে আর তখনি প্রচণ্ড এক আকর্ষণ অনুভব করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। হিমালয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় আবার ঘরের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে স্ত্রী-পুত্রের মুখ। তখন আবার ঘরের আকর্ষণে ফিরে আসি।

জ্ঞানানন্দ মহারাজ চক্চকে চোখে অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন আমার মুখে। অনুজ্জ্বল বিজলী বাতির আলোয় তাঁর চোখের চলকানী নজরে পড়ে আমার।

মহারাজের পূর্বাশ্রম কোথায় ছিল? কলকাতায় কি?

জ্ঞানানন্দজী আমার প্রশ্নে মৃদু হেসে বললেন, পূর্বাশ্রমের কথা সন্ন্যাসীর বলা নিষেধ।

নিষেধের কথা আমারও জানা। তবু এ-প্রশ্ন প্রতিটি গৃহী করে থাকে সব সন্ন্যাসীকে। আমিও তাই করেছি।

স্বামী আত্মানন্দজীর কাছে শুনেছি জ্ঞানানন্দজীর পারিব্রজ্য শেষ হওয়ায় জটাশংকর হয়েছেন আজ। ইচ্ছে ছিল জানার, এরপর উনি কি করবেন? স্থির হয়ে বসবেন কি কোনো গুহায় অথবা সমাজ-সংসারের হিতে ধর্মসংস্থাপনের জন্য আশ্রম গঠন করবেন। শত শত মানুষের দুঃখ ক্লেশ নিবারণের জন্য ব্রতী হবেন কি? পাছে উনি বিব্রত হন তাই প্রশ্ন করতে পারিনি।

বললাম, জানি। আমার শ্রীগুরুদেব স্বামী প্রণবানন্দ পিতাজী মহারাজও সন্ন্যাসী। তাঁর পূর্বাশ্রমের সব না জানলেও কিছু জানি। তিনি বাঙালী এবং তাঁর পূর্বাশ্রম কলকাতার জোড়াসাঁকো।

জ্ঞানানন্দজী জিজ্ঞেস করলেন, বর্তমানে তিনি কোথায়?

কালিঘাটে। আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন।

খানিক চুপচাপ দু'জনে। জ্ঞানানন্দজীর মুখে সর্বদা এক মৃদু হাসি

বিরাজ করছে। ওঁর চোখে রাজ্যের প্রেম আর শান্তি। আকর্ষণও অদ্ভুত। টানা টানা সুদীর্ঘ চোখ দুটো বড় মায়াময়। এ চোখ যেন বড় চেনা। কোথায় দেখেছি কে জানে।

মহারাজ, কত বছর সন্ন্যাস নিয়েছেন?

জ্ঞানানন্দ হেসে বললেন, কি হবে জেনে?

না, এমনি। এটা আমার এক কৌতূহল বলতে পারেন।

বিশ বছর হল।

আচমকা একটা ধাক্কা খেলাম যেন। বিশ বছর···বিশ বছর···

আমিও বিশ বছর ধরে হিমালয়ে ঘুরছি। বিশ বছর আগে এই বদরীনারায়ণে প্রথম এসেছিলাম।

বললাম, জানেন, ঠিক বিশ বছর আগে প্রথম এসেছিলাম এখানে। তারপর কতবার এলাম।

জ্ঞানানন্দজী বললেন, বার বার এখানেই আসেন নাকি?

এ-অঞ্চলে এলে একবার দর্শন করে যাই।

আপনি তো ভাগ্যবান।

কথাটা বলে জ্ঞানানন্দজী খানিক স্থির হয়ে ফায়ার প্লেসের আগুনের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, পারিব্রজ্যে বেরিয়ে বিশ বছর আগে প্রথম বদরীনারায়ণ আসি।

মুখদিয়ে আমার আপনি বেরিয়ে গেল, তারপর এই দ্বিতীয়বার। তাই না?

অবাক হয়ে আমার মুখে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি করে জানলেন?

বিশ বছরের মধ্যে এখানে আবার এলে যে আমার সঙ্গে আর দেখা হত না আপনার। হাসতে হাসতেই বললাম।

কেন বলুন তো?

এক অহল্যার মুক্তি ঘটত। ফলে আপনার আসা আর হত না।

জ্ঞানানন্দ যেন ভীষণ ভাবে চমকালেন। আমার ভেতরে

প্রত্যাশার সাফল্যের আলোটা এক ঝলক বিদ্যুৎ চমকে দিয়ে গেল।

কাঁপা গলায় জ্ঞানানন্দ মহারাজ বললেন, আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

হাত জোড় করে বললাম, আমায় ক্ষমা করবেন মহারাজ। মাঝে মাঝে নিজের তৈরি গল্পে অন্যকে বড় জড়িয়ে ফেলি। ওটা আমার স্বগতোক্তি।

জ্ঞানানন্দ মহারাজ বুঝি সহজ হতে পারছেন না। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি গল্প লেখেন ?

হেসে বললাম, লিখি, তবে নিজের জন্য। যাই হক, কাল তো ফিরছেন শুনলাম, ঋষীকেশ থেকে অন্য কোথাও যাবেন, না-কি ওখানেই থাকবেন ?

জ্ঞানানন্দ মহারাজ বললেন, ইচ্ছে আছে আপনাদের শহরটা ঘুরে আসব। থাকব দিনকতক ?

কলকাতায় ?

হ্যাঁ।

কলকাতায় পরিচিত কেউ আছেন ? অবশ্য না থাকলে এ অধমের ঘরে পায়ের ধুলো দিলে ধন্য হব।

জ্ঞানানন্দ সহজ হয়েছেন। সামান্য উঁচু গলায় হেসে বললেন, অধম কে ? সংসারে থেকে বার বার দেবতাত্মার কাছে যিনি ছুটে আসেন তিনি আমার নমস্যঃ।

মহারাজকে আমার উদ্দেশ্যে করজোড়ে নমস্কার করতে দেখে বলে উঠলাম, আমার পাপ আর বাড়াবেন না। সংসারী মানুষ, কত আজে-বাজে কাজ করতে হয়। আপনি মহাত্মা···

আমার কথায় বাধা দিয়ে বললেন, আপনিও মহাত্মা।

কথায় কথা বাড়ে। তাই চুপ করে থাকলাম।

আমার কৌতূহল বাড়ছে। কথায় কথায় যতটুকু জেনেছি তাতে

ভুল করেছি বলে মনে হয় না। তবু আর একটি প্রশ্ন বাকি আছে। এ প্রশ্নের জবাব পেলেই আমার কৌতূহল মিটবে।

কলকাতায় কোথায় উঠবেন? কোনো আশ্রম বা মঠ আছে আপনাদের?

জ্ঞানানন্দজী খানিক স্থির হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, না। উঠব নিজেদেরই বাড়িতে, আমহার্স্ট স্ট্রীটে।

যদি আপত্তি না থাকে ঠিকানাটা বলবেন। কলকাতায় দেখা করব আপনার সঙ্গে।

জ্ঞানানন্দ মহারাজ বললেন, আগে হৃষীকেশ যাই তারপর বলবখন। সঙ্গেই তো থাকছেন আপাতত।

কৌতূহল তোলপাড় করছে, কিন্তু সৌজন্যের খাতিরে আর জিজ্ঞেস করতে পারলাম না।

জ্ঞানানন্দ মহারাজ খানিক বাদেই বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

একাকী বসে আছি খাটিয়ায় কম্বল মুড়ি দিয়ে। শুক্লপক্ষের রাত। আকাশে চাঁদ উঠেছে। কাচের জানলার বাইরে জ্যোৎস্নার মিষ্টি আলোর বন্যা। অলকানন্দার তীব্র গতির উচ্ছ্বাস স্তিমিত। পাথরের বাঁক পেরিয়ে অলকানন্দার স্তিমিত ধারার কলকল ছলছল আওয়াজে স্তব্ধ বদরীনারায়ণ মুখরিত।

গভীর রাত।

তীব্র শীতে একগাদা কম্বলের নিচে শুয়েও হিমাংকের নিচের শীতলতা অনুভব করছি।

চোখে ঘুম নেই। কাচের জানলার বাইরে জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে আছি। কখন এ আলোর পরিবর্তে সূর্যের সাতরঙা আলো লুটিয়ে পড়বে উপত্যকায়? আজকের রাতের মতো এমন অসহ্য সুদীর্ঘ রাত আমার জীবনে আর আসেনি। আর এমনভাবে একটা

কৌতূহলের সমাধান-সংবাদ বুকের নিচে নিয়ে অপেক্ষাও করতে হয়নি কখনো।

স্বামী আত্মানন্দজী এসেছিলেন রাতে। একগাদা ফলমূল আর মেঠাই নিয়ে। ওগুলি আমার রাতের আহারের জন্য এনেছিলেন।

সামনে বসিয়ে খাইয়েছেন আমায় পরম স্নেহে। বলেছেন, আজকে ফলমূল মেঠাই বিতরণ করার নিয়ম। তোমাকে না পেলে মুশকিল হত। নারায়ণ তোমায় জুটিয়ে দিয়েছেন।

বলেন কি মহারাজ! সকালে খাবারের জন্য সারা বাজার ঘুরে কি চিন্তায় না পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম, আজকের দিনটা উপোষ দিতেই হবে।

দেখ বাবা, যে যার ভাগ্যে খায়। তোমার ভাগ্যে আজ উপোষ নেই, আমাদেরও আজ অথিতি সংকার করার দরকার—তাই নারায়ণ তোমার এবং আমাদের ব্যবস্থা করে দিলেন কত সুষ্ঠুভাবে। ঈশ্বরের কত কৃপা। তিনি করুণাময়।

অনেক প্রশ্ন করেছেন অনেক প্রশ্নের জবাবও দিয়েছেন। তার মধ্যে জ্ঞানানন্দ মহারাজের কথাও ছিল। উনি যে বিশ বছর সাধনার পর আত্মদর্শন করে সংসারে ফিরছেন গুরুর নির্দেশে সে কথাও বলেছেন।

প্রশ্ন করেছিলাম, গৃহে ফিরলেও আর পাঁচটা গৃহী মানুষের মতো স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার ধর্ম পালন করবেন কি? জবাব পেয়েছি, সেই নির্দেশই আছে মহাতাপস গুরুদেবের। জ্ঞানানন্দজী সংসারে থেকেই ঈশ্বর সাধনা করবেন।

শেষ প্রশ্ন করেছি ভয়ে ভয়ে, উনি বিবাহিত, না অবিবাহিত?

আত্মানন্দজী বলেছেন, বিবাহিত। স্ত্রী আছেন।

ভেতরে ভেতরে অপূর্ব এক আনন্দের কম্পন অনুভব করেছি। এতদিনের কৌতূহলের জবাব পেয়েছি।

মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে লাল কাশ্মীরী শাল আর

ম্যাচকরা শাড়ি ব্লাউসএ চকিত হরিণীর গতিচঞ্চলা তন্বী যুবতী রত্নাদেবীর মূর্তি। বিশ বছর ধরে একটানা প্রতীক্ষায় ধীর স্থির অহল্যার ধৈর্যের বাঁধে ফাটলধরা ভেঙেপড়া মূর্তিটিও বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে চোখের সামনে।

বাইরে উপত্যকায় তখনো চাঁদের আলো লুটোপুটি খাচ্ছে। রাত আর কত বাকি? কবে এই নিশাসন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে প্রভাতের রজত স্পর্শে পৃথিবী উজ্জ্বল হবে? ভেতর থেকে কে যেন বলল, দিন আগত ওই।

কাচের জানলার বাইরে তাকিয়ে মন আমার ডানা মেলে ভেসে চলে আমহার্স্ট স্ট্রীটের সেই নিঃসঙ্গ বাড়িটায়—যে বাড়ির এক বধূ বিশ বছর ধরে তাঁর অরূপ রতনের সন্ধানে হিমালয়ের গহনে-নির্জনে ঘুরে ঘুরে শেষে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে।

মনের মতো আমারও যদি দুটি ডানা থাকত তাহলে এ মুহূর্তে রত্নাদেবীর প্রতীক্ষার পরম সংবাদটি বয়ে নিয়ে যেতাম। বলতাম, আপনার অরূপ রতনের সন্ধান আমি এনেছি। আমার কৌতূহল এবার নিশ্চয় ক্ষমা করবেন।

॥ চার ॥

সিলভার পাইন, দেবদারু আর চীড় অরণ্যের ঘন কালো পটভূমির পিছনে অন্ধকার আকাশে প্রথম উষার আবছা আলো ফুটছে। ঝকঝকে একরাশ রাতজাগা তারা উষার প্রকাশে ম্রিয়মাণ। ব্যতিক্রম কেবল শুকতারা। একাকী আকাশের এক কোণে তখনো জ্বলছে দপ দপ করে। খানিক বাদে তারামণ্ডলের অন্য সবার মতো রাতজাগা শুকতারাও বিদায় নেবে।

ব্রাহ্মমুহূর্ত আসন্ন।

পূব আকাশের কোলে অরণ্যাবৃত পর্বতশ্রেণীর শীর্ষদেশ থেকে ধীরে ধীরে অন্ধকার সরে যাচ্ছে। কালো আকাশ ক্রমেই ঘসা কাচের মতো হয়ে উঠছে। গাছ-গাছালির ঘুমন্ত পাখিদের তন্দ্রা টুটেছে। ওরা নিজেদের ভাষায় কি যেন বকছে। একটানা কিচির-মিচির শব্দ ব্রাহ্মমুহূর্তকে মুখরিত করে তুলছে।

উষার প্রথম আলো ফুটল। পূব আকাশে আলোর বন্যা। সিলভার পাইনের বিনম্র তেল চকচকে পাতায় উষার আলো পিছলে পড়ছে। অরণ্যরেখার ওপর দিয়ে একদল টিয়া পাখি টি-টি-টি শব্দ করে বাতাস কেটে পশ্চিম আকাশের দিকে ভেসে গেল।

শোনপ্রয়াগ শীতের কাঁথা সরিয়ে জেগে উঠছে। ছোট্ট সমতলের অস্থায়ী অতিথিরা জাগছে একে একে। কেউ কেউ লোটা হাতে নির্জন নদী তীরে বা জঙ্গলে পাড়ি জমিয়েছে ইতিমধ্যে। পাশাপাশি চায়ের দোকান মেঠায়ের দোকানের ঝাঁপ খুলছে। উনুনে আঁচ পড়ছে। উনুনের ধোঁয়া ভোরের কুয়াশাকে কলুষিত করে শোন-প্রয়াগের মৃতজীবন সঞ্জীবিত হচ্ছে ক্রমেই।

কিছু পরে যাত্রীরা বেরিয়ে পড়বে পরম তীর্থের পথে—কেদারনাথ দর্শনের জন্য। তখন এই ভরাট অস্থায়ী জীবন আবার ঝিমিয়ে পড়বে পরবর্তী যাত্রীর আগমন পর্যন্ত।

জোড়া কম্বলমুড়ি দিয়ে প্রকৃতির বিশুদ্ধ পরিবর্তন দেখছিলাম খোলা বারান্দায় শুয়ে। ঘর পেলেও ঘরের বাইরে কাটাতে হয়েছে রাতটা। ব্রাহ্মমুহূর্তে ঘুম ছুটে গেলেও চোখের পাতা আমেজে ভারী হয়ে আছে। মাথা পর্যন্ত কম্বলমুড়ি দিয়ে আবার চোখ বুজলাম।

ভাইসাব, ওঠো। ভোর হয়ে গেছে।

নরম হাতের ঠেলাঠেলিতে আমেজধরা তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। কিন্তু আমেজ কাটল না। পাশ ফিরে শুলাম।

কম্বল সরিয়ে মাথার চুলে আঙ্গুল বুলিয়ে গৌরী বলল, পাশ ফিরলে যে, উঠবে না?

এমন আদর পেলে কে যে উঠতে চায় জানিনা—আমার কিন্তু এবার সত্যি ঘুম পেয়ে গেল। গৌরীর প্রশ্নের কোনো জবাব দিলাম না।

সস্নেহ আদর কতক্ষণ পেয়েছি খেয়াল নেই। হঠাৎ সেই আদর অত্যাচারে রূপান্তরিত হল। চুলে টান পড়ল। একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা মাথার চুল বেয়ে অনুভূতির শিরায় ছড়িয়ে পড়তেই মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে দেখলাম গৌরী হাসছে আমার মুখ চেয়ে।

দেখছ তো কত বেলা হয়েছে? এবার ওঠো।

গৌরী এই ভোরেই চান করেছে দেখছি। ওর লালচে চুলের ডগায় শিশিরের মতো বিন্দু বিন্দু জল টলটল করছে। কপালে থালার মতো একটা লাল সিঁদুরের টিপ পরেছে। সকালের সোনা রোদ ওর মিষ্টি মুখে কোন এক অজানা সুখের পরশ বুলিয়ে দিয়েছে যেন।

রাগত সুরে বললাম, আদর করতে করতে এমন চুল ধরে টানলে কেন?

গৌরী ফিক্ করে হেসে বলল, বেশি আদর করলে যে আজ এখানেই থাকতে হত, তাই।

আমার খুব লেগেছে।

এখনো লাগছে?

গৌরী চুল ধরে টানার পরই কিন্তু চুলে আবার আগের মতোই বিলি কাটছিল। বললাম, এখনো জ্বালা করছে।

গৌরী হঠাৎ আমার কম্বলটা গা থেকে টেনে খুলে নিতেই উঠে বসলাম।

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। বেলা বেড়ে যাচ্ছে।

গৌরী আমার গামছা আর পেস্ট লাগানো ব্রাশ এগিয়ে দিয়ে বলল, ল্যাভেটরির চাবি দরজার পাশে লুকিয়ে রেখেছি। বড্ড ফালতু লোকের ভিড়। ওখান থেকে চাবিটা নিয়ে যাও।

তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে ফিরে এসে দেখি আমার বিছানা গোছান বাঁধা শেষ। জামা প্যান্ট সোয়েটার আর জুতো বারান্দায় সাজিয়ে রেখে ডাণ্ডিতে ওর মাকে বসাবার বন্দোবস্ত করছে।

আমাকে ফিরতে দেখে জিজ্ঞেস করল, আজকের ডেরা কোথায় হবে?

বললাম, রামওয়াড়া চটিতে।

গৌরী জিজ্ঞেস করল, ওদের তাহলে সোজা রামওয়াড়ায় চলে যেতে বলি?

না। এখন ওরা মাকে গৌরীকুণ্ডে নিয়ে যাক। ওখানেই আমরা দুপুরের খাওয়া সারব। বিকেলে রামওয়াড়া গেলেই চলবে।

গৌরী ডাণ্ডিওলাদের যথাযথ নির্দেশ দিয়ে ওর মাকে ডাণ্ডিতে বসিয়ে বিদায় জানাল।

মন্দির কমিটির রেস্ট হাউসের হিসেব মিটিয়ে দিয়ে আমরা নেমে এলাম শোনপ্রয়াগ বাসস্ট্যাণ্ডে। বেশ খানিকটা জমি সমতল এখানে। একপাশে পাহাড় আর একপাশে মন্দাকিনী নদী। নদীর

ধারে অস্থায়ী আস্তানা বানিয়ে মানুষের বসবাস। বসবাস যদিও ক্ষণিকের অতিথিদের। ত্রিপল আর চট দিয়ে ঘর বানিয়ে যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতিটি ঘর সংলগ্ন হোটেল আর চায়ের দোকান। মুদি দোকানও আছে বেশ কয়েকটি। সমতল জায়গায় সারিবন্দী বাস আর ট্যাকসি।

কেদারনাথ তীর্থপথে শোনপ্রয়াগই শেষ মোটরবাস পথ। এরপর পথ তৈরি হয়ে গেলেও এপারের পাহাড়ের সঙ্গে ওপারের পাহাড়ের সংযোগ হয়নি। বহমান নদীর ওপর বিশাল পাকা সেতুর কাজ চলছে। সেতুটি হয়ে গেলেই কেদারনাথের পায়ে হাঁটা পথ ফুরিয়ে যাবে। আর তখন কেদারনাথও বদরীনারায়ণের মতো হয়ে উঠবে জনবহুল।

সমতল জমিটুকু পার হয়ে আমরা চওড়া পথে এসে পড়লাম। তারপর বাঁ দিকে মোড় নিয়ে চড়াই ওঠা শুরু করলাম। চওড়া পথ সোজাসুজি নদীর ওপর সেতু পার হয়ে ওপারের পথে গিয়ে মিশবে। বাঁ দিকের চড়াই পথ অস্থায়ী। পায়ে চলা যাত্রীদের জন্য বানানো।

ত্রিযুগীনারায়ণের পথ বাঁয়ে ফেলে এগিয়ে চলি। ওপথটি গভীর অরণ্যলোকের আলোছায়ায় মাইল তিনেক গিয়ে শেষ হয়েছে ত্রিযুগীনারায়ণে। একযুগ আগে রামপুর থেকে ত্রিযুগীনারায়ণ ঘুরে এই পথে নেমেছিলাম শোনপ্রয়াগে। তখন শোনপ্রয়াগ চটি ছিল এদিকটায়। এখন ব্রিজ তৈরি করার জন্য নতুন অস্থায়ী চটি কিছুটা পিছনে তৈরি করায় পুরনো চটি উঠে গেছে।

চড়াই পথ উঠতে উঠতে গৌরী জিজ্ঞেস করল, ত্রিযুগীনারায়ণে কি আছে?

বললাম, হর-গৌরী আর নারায়ণের মন্দির আছে ওখানে। সত্য-যুগে ওখানেই নারায়ণের পৌরহিত্যে হর-গৌরীর বিয়ে হয়েছিল?

গৌরী হঠাৎ উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল, সত্যি?

গৌরীর সঙ্গে মজা করার জন্য বললাম, সত্যি মিথ্যে তো তুমিই বলতে পার।

আমি? গৌরী অবাক হয়ে আমার মুখে তাকিয়ে থাকল।

বললাম, তুমি ছাড়া আর কে জানবে বল? আমি 'হর' হলে বলতে পারতাম।

গৌরীর মুখটা হঠাৎ লাল হয়ে উঠল। আমার হাতে কঠিন একটা চিম্‌টি দিয়ে বলল, তুমি খুব অসভ্য। কাহিনী-টাহিনী কিছু থাকলে বল।

রসিকতা ছেড়ে ত্রিযুগীনারায়ণের কাহিনী বললাম। সত্যযুগে হর-গৌরীর বিয়ে হয়েছিল এখানে। সেই বিয়ের পুরোহিত নারায়ণ যজ্ঞ করেছিলেন এখানে। যজ্ঞের সেই আগুন সত্যযুগ থেকে আজও অনির্বাণ রয়েছে। ওই আগুনকে বলে ত্রিযুগধূনি।

গৌরী অবাক প্রশ্ন করে, বল কি! তিনযুগ ধরে আবার একটা ধূনি জ্বলে নাকি?

পাণ্ডারা তো তাই বলেন।

তুমি দেখেছ ত্রিযুগধূনি?

দেখেছি।

সত্যি?

সত্যি মিথ্যে তুমিই জান।

আমার পিঠে এক কিল মেরে গৌরী বলল, আবার!

ওর টানাটানা চোখে কৃত্রিম রাগের প্রকাশ আমার ভাল লাগে দেখতে। হেসে বললাম, বারবার তাহলে সত্যি কি-না জিজ্ঞেস করছ কেন?

অবিশ্বাস্য লাগছে। বিজ্ঞানের যুগে বিশ্বাস হয়? তুমিই বলনা, বিশ্বাস হয় এ-সব?

বিশ্বাস করলে ক্ষতি কি? গহন এই হিমালয়ে বিজ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে ঘুরলে অনেক কিছুই অলীক মনে হবে। তাতে আনন্দ কম।

তার চেয়ে সব কিছু বিশ্বাস করে চোখ চেয়ে ঘুরলে উপলব্ধির আনন্দ আর উত্তেজনা পাবে।

গৌরী আনমনা হয়ে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ বলল, তোমার কথাই ঠিক। বিশ্বাস করে চোখ খুলে ঘুরলে যে উপলব্ধি হয় তা চোখ বুজে বা অবিশ্বাসে হয় না। আধুনিক শিক্ষার গুণে সরল বিশ্বাসবোধ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আর এজন্যেই আমাদের সমস্যা আর দুঃখ। অথচ যারা আমার মায়ের মতো আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নয়, তারা সরল বিশ্বাসে অনেক কিছু পায়।

মায়ের আগ্রহে গৌরী দুর্গম তীর্থ কেদার-বদরী এসেছে। এ কথা ওর সঙ্গে আলাপের দিনই বলেছিল আমায়। ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, শুধুই মায়ের আগ্রহে ? তোমার আগ্রহ নেই ?

গৌরী বলেছিল, না। হিমালয় ভাল লাগলেও ওসব দুর্গম মনুষ্য-বর্জিত জায়গা আমার পছন্দ নয়। মুসৌরী আমার ভাল লেগেছে। লাল টিব্বায় দাঁড়িয়ে দিগন্ত রেখায় সাদা সাদা পর্বতশৃঙ্গগুলো আমায় আকর্ষণ করেছে। তাবলে, ওদের কাছে যেতে হবে ? মোটেই নয়। পায়ে হাঁটতে ভাল লাগলেও তা শহরে। বন জংগল পাহাড় পর্বতে একাকী পথ-হাঁটার কোনো চার্ম নেই। আমার উৎসাহ নেই।

বলেছিলাম, কিন্তু যে পথে যাওয়া স্থির করেছ সেখানে তো শহরের কোনো চিহ্ন নেই। নেই মুসৌরীর মতো দোকান-হোটেল, গাড়ি-বাড়ি, আলো আর মানুষজন। সে যে গহন হিমালয়।

কি করব ? মায়ের জন্য যেতেই হবে। মাকে তো আর একা ছেড়ে দিতে পারি না। পারলে হরিদ্বারের হর-কি প্যারীর ঘাটে বসে গঙ্গার কালচে জলের দিকে চেয়ে সময় কাটিয়ে দিতাম।

চড়াই পথের শেষে বেশ কিছুটা আলগা মাটির উৎরাই পথ। বৃষ্টি হলেই আলগা মাটি ধসে যায়। পথ ঠিক রাখার জন্য বড় বড় গাছের মোটা গুঁড়ি পাতা আছে মাটির নিচে। এ-পথটুকু যাত্রীরা সাবধানে পার হয়। গৌরীর হাত ধরে কঠিন উৎরাই নেমে এলাম।

বাসুকী নদীর ওপর তৈরি নতুন লোহার সেতু পার হয়ে কেদারখণ্ডে এসে পড়লাম।

গভীর অরণ্যাবৃত অঞ্চল। কিছুটা জংগল সাফসুফ করে বর্ডার-রোড কর্মীদের ছাউনী। কাঠ চেরাই কল পাথর ভাঙার যন্ত্র থেকে শুরু করে রোড রোলার পর্যন্ত আনা হয়েছে এপারে। ছাউনীর আশপাশে চা পাকোড়ি আর মেঠায়ের দোকান গজিয়ে উঠেছে যাত্রীদের জন্য। কিছু খচ্চর, ডাণ্ডি-কাণ্ডিও রয়েছে সামনের চড়াই পথে যাত্রী বহনের জন্য।

গৌরী ক্লান্ত দেহে একটা চায়ের দোকানের সামনে পাতা বেঞ্চে বসে পড়ল। সামান্য পথ হেঁটেই ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সামনে রয়েছে বুক-ফাটা চড়াই। উচ্চতা কম করে পাঁচ-ছ'শ ফুট হবে। জিগজ্যাগ পথ খাড়াই পাহাড়ের গা পেঁচিয়ে ঘুরে ঘুরে উঠেছে আকাশের দিকে।

গৌরী খানিক দম নিয়ে শুধলো, কোন পথে যেতে হবে?

সামনের জিগজ্যাগ পাকদণ্ডি দেখিয়ে বললাম, ও পথে।

গৌরী বড় বড় চোখে চড়াই-এর দিকে তাকিয়ে গভীর এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, একটু চা খাব।

দোকানীকে দু'পেয়ালা চা দিতে বললাম।

গৌরীর পাশে বসে বললাম, তোমার জন্য একটা ঘোড়া নিই এখান থেকে। পথ খুব চড়াই, কষ্ট হবে।

গৌরী চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে তাকাল আমার দিকে। কোনো উত্তর দিল না। বুঝলাম ঘোড়ার পিঠে বসতে ওর আপত্তি। গতকালও বলেছিলাম ডাণ্ডি-কাণ্ডি বা ঘোড়া নিতে। রাজী হয়নি। বলেছিল, তুমি হাঁটলে আমিও হাঁটব। তুমি ঘোড়ায় চড়লে আমিও ঘোড়ায় চড়ব। জবাবে বলেছিলাম, ঘোড়ার পিঠে চেপে হিমালয় ভ্রমণের স্বাদ পাওয়া যায় না। তুমি তো আর শখ করে আসনি, তবে ঘোড়া নেবে না কেন?

গৌরী বলেছিল, তুমি নেবে না তাই।

আমি তোমার কে? আমি কষ্ট করলে তোমার কি যায় আসে? আমার জন্যে তুমি কেন কষ্ট করবে?

অদ্ভুত রহস্যময় হাসি হেসেছিল গৌরী। বলেছিল, কেউ হলেই বুঝি কষ্ট করে? তুমি আমার কেউ নয় বলে আমি ঘোড়ার পিঠে যাব আর তুমি আমার পাশে পাশে পায়ে হাঁটবে?

আমার অভ্যাস আছে।

আমারও হয়ে যাবে।

এ কথার পর আর তর্ক বা সাধাসাধি চলে না। তাই মেনে নিয়েছিলাম ওর পায়ে হাঁটা।

চায়ের দাম চুকিয়ে গৌরীকে বললাম, ঘোড়া না নাও অন্তত চড়াই পথটুকুর জন্যে একটা কাণ্ডি নাও। নেবে?

না। পায়ে হাঁটব।

পারবে না ওই চড়াই উঠতে।

আমি না পারলে তুমি পারবে না আমায় নিয়ে যেতে?

গৌরীর কথায় সমর্পণের সুর বাজছে। সমর্পিতাকে ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বললাম, চল, দেখি পারি কি না।

গৌরী আবেগে আমার হাত জড়িয়ে ওর নরম বুকের মধ্যে টেনে নিল। আমি বিচিত্র এক উষ্ণতার স্বাদ পেলাম।

আঁকাবাঁকা উত্তুঙ্গ চড়াই পথ। মাঝে মাঝে ঝুরো কাঁকর মেশান মাটি। রবারশোল ঝুরো কাঁকুরে পথে স্লিপ করে। কয়েকবার পা পিছলে গেছে গৌরীর। পাশে থাকায় আছাড় খায়নি। ওর হাত ধরেছি যতবার ততোবারই হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে। শেষে একবার আছাড় খেয়ে আমার হাতে ওর হাতের শুধু নয় দেহের ভারটাও ছেড়ে দিয়েছে। সাবধানে লাঠিতে ভর দিয়ে গৌরীকে টেনে নিয়ে চলেছি কঠিন পথে।

গৌরীর সঙ্গে আমার পরিচয় মাত্র দিন দশ-বারো। ঋষিকেশের এক ধর্মশালায় দুটি ঘরের বাসিন্দা ছিলাম আমরা।

…আমি একাকী মানুষ। সারাদিন টো-টো করে ঘুরে বেড়াতাম।

কখনো বাজার-বাসস্ট্যাণ্ড, রেলস্টেশনে, কখনো ভরত মন্দির ত্রিবেণী ঘাট আর চন্দ্রেশ্বর শিবের মন্দিরে আবার কখনো লছমনঝুলা গীতা ভবন কিংবা ডিভাইন লাইফ সোসাইটিতে চলে যেতাম। এর পরও হাতে সময় থাকলে ধর্মশালার বৃদ্ধ ম্যানেজারের সঙ্গে বসে সুখ-দুঃখের গল্প করতাম।

একদিন বিকেলে ঘুরতে বেরবার সময় ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখলাম ডরাট চেহারার এক সুন্দর তরুণী ম্যানেজারের চেয়ারে বসে আছে। বয়েস বোধকরি বাইশ-তেইশ হবে। পরনে বেলবটস্ এবং চাপা হাওয়াই সার্ট। ফলে মেয়েটির স্বাস্থ্যের বাড়তি কিছু উপচে পড়েছে। অনভ্যস্থ চোখ সেই বাড়তি সৌন্দর্যটুকুর দিকে তাকিয়ে লজ্জা পায়। আমিও থমকালাম তাই।

ম্যানেজারের সঙ্গে কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে বেরিয়ে আসছি এমন সময় ম্যানেজারই আমায় ডেকে বলল, গৌরীর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়নি তো?

বুঝলাম চেয়ারে বসা মেয়েটার নামই গৌরী। এই ধর্মশালায় আমার পাশের ঘরেই আছে। সুন্দরী বলে নজরে পড়েছে আগেই। তবে আজকের মতো এমন খুঁটিয়ে দেখিনি ওকে। ঈষৎ হেসে মাথা নেড়ে জানালাম যে আলাপ হয়নি।

ম্যানেজার বলল, তোমার পাশের ঘরে আছে। ওরা মা আর মেয়ে। কেদারনাথজী আর বদরীনাথজী দর্শন করতে চায়। তুমি তো আগে কয়েকবার গেছ ও-পথে। ওদের পথ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দাও না।

গৌরী নামের উদ্দাম যৌবনবতী মেয়েটি চেয়ার ছেড়ে উঠে

দাঁড়িয়ে বাঙালীর কায়দায় হাতজোড় করে নমস্কার জানাল। তারপর বিস্ময় ঝরানো সুরে বলল, আপনি কেদার-বদরীনারায়ণজী আগে গেছেন ?

হেসে বললাম, বার কয়েক গেছি ও-পথে।

এবারও যাবেন বুঝি ?

ইচ্ছে আছে।

কবে যাবেন ?

বাসের ভীড় একটু কমলেই যাব।

ম্যানেজার মশাইও আমাদের ওই কথাই বলেছেন। গৌরী বৃদ্ধ ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলল। তারপর আমার চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, পথ কেমন ?

বললাম, ভালই। প্রায় সবটা পথই এখন বাস চলছে।

গৌরী বলল, তবে যে শুনলুম অনেক পথ পায়ে হাঁটতে হবে।

অনেক আর কই ? কেদারনাথে মাত্র চব্বিশ-পঁচিশ কিলোমিটার এবং বদরীনাথে মাত্র আধ কিলোমিটার পথ পায়ে হাঁটতে হয় এখন।

গৌরী বলল, বাব্বা, চব্বিশ-পঁচিশ কিলোমিটার হাঁটতে হবে! মা তো পারবেই না, আমিও পারব না। অত পথ চড়াই উৎরাই করা কি সহজ কথা ? আপনিই বলুন।

মেয়েটি ভারি সহজ। কথাবার্তায় এতটুকু জড়তা নেই।

ওকে আশ্বস্ত করার জন্য বললাম, পায়ে হাঁটতে না চাইলে পনি অথবা ডাণ্ডি বা কাণ্ডি নিতে পারেন।

ডাণ্ডি-কাণ্ডি কি ?

ডাণ্ডি হল পালকির মতো, চারজন মানুষ বয়ে নিয়ে যায়। আর কাণ্ডি হল বেতের ঝুড়ির চেয়ার, একজন মানুষ পিঠে করে বয়।

গৌরী খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল, বাঃ, ভারি মজার ব্যাপার তো! মাকে তাহলে ডাণ্ডিতে নিয়ে যাব।

মায়ের কথা উঠতেই গৌরী সলজ্জ হাসল। বলল, এই দেখুন,

মা'র সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি এতক্ষণ। চলুন না আমাদের ঘরে, মার সঙ্গে আলাপ করবেন।

আমার ঠিক পাশের ঘরটিতে গৌরীরা আছে। ওকে এবং ওর মাকে আগেই দেখেছি তবে আলাপ হয়নি। গৌরীর সঙ্গে ওদের ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম বৃদ্ধা এক মহিলা গভীর মনোনিবেশে তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ছেন। মহিলা যৌবনে সুন্দরী ছিলেন। দুধের মতো সাদা ভয়েলের থান পরনে। মাথায় একরাশ সাদা-কালো চুলের রাশি।

আমাদের দেখে বই থেকে চোখ তুলে তাকালেন বৃদ্ধা। সপ্রশ্ন দৃষ্টি ফেরালেন গৌরীর মুখে। গৌরী আমার পরিচয় দিল। বলল, পাশের ঘরে থাকেন। আজ আলাপ হল। উনি কেদার-বদরী যাচ্ছেন। আগেও গেছেন কয়েকবার। তাই তোমার সঙ্গে আলাপ করাতে নিয়ে এলাম।

সচ্! বৃদ্ধার মুখে আনন্দ-বিস্ময়ের বিচিত্র এক চমক খেলে গেল। জিজ্ঞেস করলেন, কব যাওগে বেটা?

বললাম, ক'দিন বাদেই যাব। এখন দারুণ ভীড়।

হমে ভী জানা তুমহারা সাথ বেটা।

হেসে মাথা হেলিয়ে সায় দিলাম।

বৃদ্ধা খুশি হলেন। আমাকে পাশে বসিয়ে গৌরীকে বললেন, ছেলেকে চা-মেঠাই খাওয়া বেটি।

গৌরী স্টোভ জ্বেলে চায়ের জল বসাল। একটা পলিথিনের রেকাবে চারটে বরফি আর এক গ্লাস জল আমার সামনে রেখে বলল, মায়ের হাতের তৈরি বরফি, খেয়ে নিন।

বৃদ্ধা আমায় জিজ্ঞেস করলেন, বেটা, তোমার ঘর কোথায়?

বললাম, কলকাতায়।

প্রথমটা খুব অবাক হলেন। তারপর হেসে বললেন, তোমার হিন্দী বুলি শুনেই বুঝেছি বাঙলা অথবা আসামের হবে।

গেছেন কখনো বাঙ্লাদেশে ?

বৃদ্ধা খানিক চুপ করে থেকে বললেন, কয়েকবার গেছি। থেকেছি সেখানে। তবে সে অনেকদিন আগে।

ওখানে আপনার কেউ ছিলেন বুঝি ?

বৃদ্ধা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হাঁ বেটা। এখন সে দেশ পাকিস্থান হয়ে গেছে।

গৌরী তিনকাপ চা সামনে রেখে মায়ের কোল ঘেঁসে বসল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আরো অনেক কথা হল। এদের সহজ সরল আতিথ্য আমার ভালই লাগছে। একাকী তীর্থপথে এসে এমন স্নেহস্পর্শ কার না ভাল লাগে।

কথায় কথায় কেদার-বদরীর পথ ইত্যাদি অনেক কিছুই জেনে নিল গৌরী আর ওর মা। শুনল আমি একাকী এসেছি। আমার একাকী আসার কথা শুনে বৃদ্ধা যেন অতিরিক্ত কিছুটা খুশি হলেন। বললেন, ভালই হল। আমার এই এক মেয়ে—ছেলে নেই। আজ থেকে তুমিই আমার ছেলে। মাকে তীর্থ করিয়ে দেবে তো ?

কি জবাব দেব ? হিমালয়ে চলার পথে নির্দিষ্ট দোসর আমার পছন্দ নয়। নানা অভিজ্ঞতায় দেখেছি সঙ্গীর কারণে ভ্রমণ ব্যর্থ হতে। এদের আপন করে নেওয়াটায় কোনো কৃত্রিমতা নেই। তবু এক কথায় হ্যাঁ'বা না করতে পারছি না। চুপ করে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে থাকলাম।

গৌরী বোধকরি আমার মনোভাব আঁচ করতে পেরেছে। নীরবতা ভঙ্গ করে জিজ্ঞেস করল, আপনার কোনো অসুবিধে আছে ?

অসুবিধে কি ? শত শত মানুষ যাচ্ছে আর আপনারা যেতে পারবেন না ?

আমাদের কথা নয়, আপনার। আমাদের সঙ্গে নিতে আপনার অসুবিধে হবে কি-না তাই জিজ্ঞেস করছি।

এ একেবারে সোজা এবং সরাসরি প্রশ্ন। জবাবটাও সোজা দিতে হবে আমায়। বললাম, অসুবিধে নেই কোনো। তবে, আমি একা মানুষ। আমার সঙ্গ আপনাদের কেমন লাগবে তাই ভাবছি।

গৌরী হালকা হেসে বলল, খারাপ লাগবে বলে মনে হয় না। আর যদি লাগেই তখন আলাদা হয়ে গেলেই চলবে। আপনি কি বলেন ?

এই রূপসী মেয়ের কাছে এতটা সোজা উত্তর আশা করিনি। হেসে বললাম, তাই হবে।

গৌরী খুশিতে উচ্ছল হয়ে মাকে বলল, উনি রাজী হয়েছেন। তাহলে আজ থেকেই তোমার ছেলে আমাদের দলে এলেন, তাইতো ?

বৃদ্ধার খুশি উপচে পড়ল। বললেন, নিশ্চয়।

উনি তাহলে আমাদের সঙ্গে আজ থেকেই খাওয়া-দাওয়া করবেন। কি বলো মা ?

ও কথা কি আর জিজ্ঞেস করতে হয়! আমরা থাকতে ও আর হোটেলে খাবে কেন ?

গৌরী হাততালি দিয়ে উঠল ছেলেমানুষের মতো।

আমি আর আপত্তি করার অবসর পেলাম না। নীরবে সব কিছু মেনে নিতে হল।

খানিক বাদেই গৌরী একটা পলিথিনের বাস্কেট নিয়ে ঘর থেকে বেরুবার আগে মাকে বলল, একবার বাজারে যেতে হবে। তারপর আমার মুখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার কোনো কাজ আছে এখন ?

না। কাজ তো ঘুরে বেড়ানো।

তাহলে চলুন না, বাজারে ঘুরে আসি একবার।

দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম ধর্মশালা থেকে।

দেরাদুন রোড ধরে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে চলেছি। ওদিকেই

ঋষিকেশের বাজার অর্থাৎ সব্জীমণ্ডি। চওড়া পিচঢালা পথ। পথের দু'ধারে বড় বড় দেবদারু অশ্বত্থ আর বটের সারি। বড় বড় আধুনিক দোতলা তিনতলা বাড়ি উঠেছে ইদানিং পথের ধারে। দোকানপাট সবই সাজান-গোছান। আলো ঝলমলে। পথের দু'ধারে নিয়ন বাতি জ্বলছে। আগের ঋষিকেশের সঙ্গে অনেক অমিল। আধুনিকতার ছাপ লেগেছে শহরের অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে।

পাশে হাঁটতে হাঁটতে গৌরী জিজ্ঞেস করল, কলকাতায় থাকেন তো ?

বললাম, হ্যাঁ।

কলকাতা নিশ্চয় আরো জমজমাট ?

হ্যাঁ। কলকাতায় গেছেন কখনো ?

না যাইনি। তবে শুনেছি। খুব ইচ্ছে আছে কলকাতা দেখার।

আসুন না একবার, ভাল লাগবে কলকাতা।

কথা বলতে বলতে বাসস্ট্যাণ্ড ছাড়িয়ে সব্জীমণ্ডিতে এসে পৌঁছলাম। বড় রাস্তার ওপরই বাজার। স্টেশন রোড আর দেরাদুন রোডের ওপর পাশাপাশি ঘরগুলোয় সব্জীর দোকান। সুন্দর করে সাজান টাটকা সব্জী। নিরামিষাশী জায়গা তাই মাছ-মাংসের দোকান নেই। ইদানিং দেখছি মুরগীর ডিম চালু হয়েছে এখানে। প্রায় সব দোকানেই ডিম বিক্রি হচ্ছে। হয়ত কালে দিনে মাংস মাছের দোকান হবে এখানে।

গৌরী দোকান ঘুরে ঘুরে সব্জী কিনল। তারপর মেঠাই-এর দোকান থেকে দই আর সন্দেশ নিয়ে আমাকে সুধলো, আর কি নেব বলুন ?

যা নিয়েছেন তাই তো যথেষ্ট মনে হয়।

কই আর যথেষ্ট নিলাম। আর কোনো মেঠাই নেব বা ফলটল কিছু ?

দরকার নেই।

আর কোনো সব্জী ?

ওরে বাবা, এত খাবে কে !

কেন আপনি ?

আমাকে দেখছি জামাই আদর শুরু করলেন।

গৌরী হেসে বলল, বাঙালীরা নতুন জামাইয়ের চেয়েও লাজুক।

তাই বুঝি ? নতুন বাঙালী জামাই দেখেছেন ?

অনেক। দিল্লীতে বাঙালীর অভাব নেই। তাছাড়া আমার বাবা ঠিক বাঙালী না হলেও বাঙলাদেশে বহুকাল কাটিয়েছেন। পাকিস্তান না হলে হয়ত পূর্ব বাঙলায় আমাদের একটা বাড়ি থাকত।

গৌরীর কথায় রীতিমতো অবাক হলাম। ওদের কোনো পরিচয়ই পাইনি। ওর দেশ কোথায়, কি জাত কিছুই জানি না। ওর মা বাঙলাদেশে গেছেন কয়েকবার এবং থেকেছেন সেখানে এ-কথা তিনি আগেই বলেছেন। এখন গৌরী বলল, ওর বাবা বাঙালী না হলেও বাঙলাদেশে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন।

মেঠাইয়ের দোকানে দাম মিটিয়ে দিয়ে গৌরী বেরিয়ে এসে বলল, একটু কফি খেলে হত।

বাসস্ট্যাণ্ডের সামনেই কফি কর্ণার।

বললাম, চলুন কফি কর্ণারে যাই।

গৌরী বলল, সেই ভাল।

দু'জনে আলো ঝলমলে কফি কর্ণারের একটা ঘেরা খোপে ঢুকে পড়লাম। গৌরী ঘরের ভারী পর্দাটা টেনে দিয়ে আমার পাশে বসল। ভেবেছিলাম গৌরী আমার টেবিলের সামনে বসবে। পাশে বসায় সামান্য আড়ষ্ট হয়ে পড়লাম। গৌরী কিন্তু খুবই সহজ। এতটুকু আড়ষ্টতার চিহ্ন নেই ওর মধ্যে। বরং কিছুটা ঘনিষ্ট হতে দেখলাম।

বেয়ারাকে কফির অর্ডার দিয়ে সহজ হবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের বাড়ি কোথায় তা কিন্তু বলেন নি।

গৌরী ছোট মেয়ের মতো হেসে বলল, বলদিকি কোথায় ?

গৌরীর তুমি সম্বোধনে বিস্মিত হলাম। কিন্তু খারাপ লাগল না। হিন্দীতে 'আপ'কে 'তুম' করে দিতে বোধহয় খুব অসুবিধে হয় না। গৌরী বাঙলা জানে না। হিন্দীতেই কথা বলছিলাম আমরা। গৌরী বাঙালী হলে আপনি থেকে এত সহজে তুমিতে নামতে পারত না বোধহয়।

বললাম, কি করে জানব বলুন ? পাঞ্জাব অথবা দিল্লী হতে পারে। উত্তরপ্রদেশও হতে পারে।

গৌরী বলল, কাছাকাছি হয়েছে। বাড়ি আমাদের রাজস্থানে। তবে দিল্লীতেই জন্মেছি, মানুষও হয়েছি ওখানে।

রাজস্থানে গেছেন কখনো ?

আবার খিল খিল করে হেসে উঠল গৌরী। বলল, দিল্লীতে মানুষ হলেও রাজস্থান আমার দেশ। প্রতি বছর অন্তত একবার যাই। আমাদের আত্মীয়-স্বজন সবই সেখানে।

রাজস্থানের কোথায় ?

উদয়পুরে। গেছ নাকি উদয়পুর ?

একবার।

সত্যি ! কেমন লেগেছে আমাদের শহর ?

ভালই।

দেখ, তুমি কলকাতার লোক আমাদের শহর দেখেছ আর আমি তোমাদের কলকাতা দেখিনি এখনো।

বললাম, আপনার সুযোগ আসেনি বলে দেখা হয়নি।

গৌরী বলল, কে বলল সুযোগ আসেনি ? রথীন কতবার আমায় নিয়ে যেতে চেয়েছে কলকাতায়। এ বছরই পাকাপাকি চলে যেতাম। আসলে আমার ভাগ্য। যাকগে সে কথা।

রথীন কে ? জিজ্ঞেস করলাম।

গৌরী বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, রথীনের কথাই বলিনি তোমায়!

আজকাল আমার এ রকমই হয়েছে। রথীন আমাদের পারিবারিক বন্ধু। ওর বাবা আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। সেই সুবাদে ওদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। তা ছাড়াও ওর সঙ্গে আমি কলেজে এক সঙ্গে তিন বছর পড়েছি। ওই তো আমার একমাত্র বাঙালী বন্ধু ছিল।

এখন তারা কোথায়?

কলকাতায়। ভীষণ লাজুক ছেলে ছিল। আমিই তো ওকে স্মার্ট করলাম। আর এখন···যাক গে···গৌরী কথার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের কলকাতা আমায় দেখাবে?

হেসে বললাম, আমাদের কলকাতা কেন? কলকাতা সবার। আপনি গেলে দেখবেন কলকাতা আপনারও।

গৌরী বলল, আচ্ছা বাবা, আমার বলাটা ভুল হয়ে গেছে। আমি বলছি কলকাতায় গেলে তুমি সাহায্য করবে তো?

অবশ্যই। যদি রাজী হন তাহলে আমাদের গরীবখানায়ও থাকতে পারেন ক'দিন।

গৌরী হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরে অবাক সুরে বলল, তোমায় আমি তুমি বলছি, আর তুমি আপনি বলছ কেন?

বললাম, ওটা অভ্যাসের ব্যাপার।

এতক্ষণেও তোমার অভ্যাস হল না? না না আমায় মোটেই আপনি বলা চলবে না। তুমি বলতে হবে।

গৌরীর কথাগুলো আদর মেশান আদেশ যেন। হাসলাম। বললাম, ঠিক আছে তুমি বলব।

বেয়ারা কফির সেট টেবিলে বসিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যেতেই গৌরী কফি তৈরি করা শুরু করল। ওর কাজকর্ম খুবই চটপটে কিন্তু বড় শান্ত। চামচ দিয়ে দুধ চিনি কফি মেশানোর টুংটাং আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দই করেনি।

আমি চুপচাপ দেখছি ওর কফি তৈরি করা। ভাবছি মাত্র ঘণ্টা

হুয়েকের আলাপ পরিচয় আমাদের। আর এই অল্প সময়ের মধ্যে এতটা একাত্মতা চিন্তা করা যায় না। মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করার ব্যাপারে আমি বেশ কিছুটা লাজুক। অবশ্য প্রথম সংকোচ কেটে যাওয়ার পর তেমন লজ্জা করে না। এক্ষেত্রে গৌরীর আর আমার বয়েসের সমতা এবং ওর নিঃশঙ্কোচ ব্যবহার আমার লজ্জা কাটিয়ে দিয়েছে। আমাকে সহজ করে দিয়েছে।

কফির পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে গৌরী আমার মুখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, কি ভাবছ?

বললাম, ভাবছি না, দেখছি তোমাকে।

চোখ দুটো বড় বড় করে তাকিয়ে বলল, আমায় দেখার মতো কি আছে!

যা আছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

তাহলে কিভাবে প্রকাশ করা যায়?

উপলব্ধি দিয়ে।

সে আবার কি? তুমি বড্ড কঠিন কথা বল, বুঝি না সব।

হেসে বললাম, সুন্দর জিনিসের সৌন্দর্য কি সব সময় ভাষায় প্রকাশ করা যায়? ওটা উপলব্ধির ব্যাপার, প্রকাশের নয়।

আমি সুন্দরী?

শুধু সুন্দরী নও সুন্দরী শ্রেষ্ঠ।

গৌরীর কান দুটো লাল হয়ে গেল। বলল, সুন্দরী না ছাই।

কথাটা ঘোরাবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, রথীন বোস সম্বন্ধে কি যেন বলছিলে? ও তোমার বন্ধু না আত্মীয় কি যেন বলছিলে তখন?

গৌরী কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলল, হ্যাঁ, ও আমার ছোটবেলার বন্ধু। পাশাপাশি কোয়ার্টার্সে ছিলাম। আমার সঙ্গে কলেজে পড়েছে। আমাদের কম্বিনেশান একই ছিল। পড়াশোনায় খুব ভাল ছিল রথীন। পরীক্ষার সময় ওর সাহায্য না পেলে আমি

হয়ত বি-এ পাশ করতেই পারতাম না। পরীক্ষার আগে নিজের ক্ষতি করেও আমাকে পড়িয়েছে। পড়াশোনায় ভাল হলে কি হবে, ভীষণ আনস্মার্ট ছিল। আমার আবার আনস্মার্ট ছেলে একেবারেই অপছন্দ।

গৌরীর কথায় বাধা দিয়ে হেসে বললাম, তাই তুমি নিশ্চয় ওকে স্মার্ট করার কাজে লেগে পড়েছিলে?

গৌরীও আমার কথায় হেসে উঠে বলল, ঠিক তাই। তিন বছর ও আমার পড়াশোনায় সাহায্য করেছে আর আমি ওকে স্মার্ট করার জন্য ক্লাবে পার্টিতে টেনে নিয়ে গেছি। যত রকম ম্যানার্স আছে সব শিখিয়েছি। টাই পরা থেকে টেবল ম্যানার্স পর্যন্ত। স্মার্ট হয়ে উঠলেও মেয়েদের কাছে ও লাজুক—গ্রামের মেয়ের মতো।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাছেও?

প্রথম দিকে। পরে ওর জ্বালায় আমাকে কম অস্থির হতে হয়েছে? তবে ওর দৌড় ছিল আমার পর্যন্ত। অন্য মেয়েদের সামনে মুখ তুলে কথা পর্যন্ত বলতে পারত না।

একবার ওকে আমাদের দেশের বাড়িতে নিয়ে গেছলাম। দিন সাতেক ছিল সেখানে। এই সাত দিনে ও প্রায় আধখানা হয়ে গিয়েছিল। লজ্জায় খেতে পারেনি। আমার বোনেদের সামনে মুখ তুলতে পারেনি। ফলে বোনেদের মজার খোরাক জুটেছিল। সব সময় আমায় আগলে আগলে চলতে হয়েছে। একদিন খাওয়ার শেষে দই সন্দেশ ফেলে ফলের প্লেট টেনে নিতে একটু অবাক হলাম। কারণ জানতাম, বাঙালীরা ফলের চেয়ে দই মিষ্টিই বেশি পছন্দ করে। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে রথীন ফলের প্লেট রেখে দই সন্দেশের প্লেট টেনে নিয়েছিল। ওর অবস্থা দেখে বোনেরা হেসে কুটি-কুটি।

গৌরীকে হাসতে দেখে বললাম, সেইজন্যে তুমি ফল মিষ্টি দই সবই কিনতে চাইছিলে তখন?

তাছাড়া আর উপায় কি বল? তুমিও তো আর একটা রথীন হতে পার!

তুমি চাইলে আমি রথীন হতে রাজী আছি।

গৌরী চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বলল, তার মানে ? কেদার-বদরীর পথে আমায় ভোগাবার তালে আছ ? না বাবা, তোমায় দয়া করে আর রথীন হতে হবে না। যেমন আছ তেমনই থাক।

গৌরী নিঃশব্দে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগল।

কফি কর্ণার জমজমাট হয়ে উঠেছে। টেবিলে কেবিনে ছেলে-মেয়েদের উচ্ছ্বসিত কলকণ্ঠ বাজছে। সঙ্গে হালকা সুরের হিন্দী রেকর্ড বাজছে কোথায়।

কফির পেয়ালা থেকে মুখ তুলে গৌরী জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, তুমি কবিতা বা গল্প-উপন্যাস কোনটা ভালবাস ?

দুটোই। তবে আধুনিক কবিতার সব বুঝতে পারি না।

রথীনেরও কিন্তু এই একই মত। ও রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্রের প্রচণ্ড ভক্ত। আধুনিক কবিদের তেমন পছন্দ করত না।

গৌরীর কথায় অবাক হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, ওঁদের লেখা কিছু পড়েছ নাকি ?

শরৎচন্দ্রের যা কিছু অনুবাদ হয়েছে হিন্দীতে তার সবই পড়েছি। রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গীতাঞ্জলি আর কিছু অনুবাদ গল্প পড়েছি।

ওঁদের লেখা তোমার কেমন লেগেছে ?

খুব ভাল। রবীন্দ্রনাথের ডেপ্‌থ অনেক। সহজে তাঁর লেখার মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। তবে শরৎজীর লেখা আমার ভীষণ ভাল লাগে। ওঁর লেখা পড়তে পড়তে মনে হয় উনি রাজস্থানের মানুষ। মেয়েদের মনের গভীরে এমনভাবে কোনো লেখককে প্রবেশ করতে দেখিনি আমি।

মনে মনে খুব গর্ববোধ করলাম। বাঙলার বাইরে একটি অপরিচিত অবাঙালী মেয়ের মুখে বাঙালী লেখকের গুণগান শুনব এটা আশার অতিরিক্ত। তবে এর পিছনে রথীন বোস নামের একটি বাঙালী ছেলের অবদান কম নয়।

গৌরী আবার বলল, জান, রথীন কলেজে পড়ার সময় গল্প লিখত। ছাপতে দেবার আগে আমায় পড়িয়ে শোনাত। ভাল লিখত। আমি এ্যাপ্রুভ করলেই তবে পত্রিকায় পাঠাত।

এখন লেখে না ?

হয়ত লেখে, জানি না।

রথীন কোথায় আছে এখন ?

কলকাতায়।

তোমার সঙ্গে যোগাযোগ নেই ?

নিয়মিত যোগাযোগ কিছুঁ নেই। দিল্লীতে এলে দেখা করে।

কলকাতায় কি চাকরী করে ?

হ্যাঁ। একটা এক্সপোর্ট মার্চেন্ট অফিসের জুনিয়ার অফিসার।

তাহলে তো কলকাতাটা ঘুরে আসতে পার।

গৌরী চুপ করে থাকল। কোন এক ভাবনার গভীরে যেন ডুবে গেল।

একটা সপ্তাহ থাকতে হয়েছিল ঋষিকেশে। কেদার-বদরীর পথে ধস নামায় বাস-চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে হাজার হাজার যাত্রীর ভিড় জমে গেল ঋষিকেশে। আমাদেরও অপেক্ষা করে থাকতে হল ভিড় কমার জন্য।

সাতটা দিনের বেশির ভাগই গৌরী আমার সঙ্গী। কখনো ওদের ঘরে কখনো আমার ঘরে বসে নানা গল্প করেছি। বহু অতীত স্মৃতির জাবর কেটেছি দুজনে। ঘুরেছি লছমনঝুলা, গীতাভবন আর ডিভাইন লাইফ সোসাইটিতে। সকালে সন্ধ্যায় ত্রিবেণীঘাটে গেছি স্নান করতে। প্রবল স্রোতে স্নান করার সময় সাহায্য করেছি গৌরীকে। যেখানে আমি লজ্জা পেয়েছি সেখানে ও আমায় সহজ করে দিয়েছে। আমরা দু'জনে দু'জনের কাছে সহজ হয়েছি।

তারপর নির্দিষ্ট দিনে কেদারনাথের বাসে যাত্রা করেছি ঋষিকেশ থেকে।

বাসে আমরা পাশাপাশি বসেছি। ওর মা সঙ্গে থাকলেও কখনো কখনো তাঁর অস্তিত্ব আমরা ভুলে গেছি। চলতি পথের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে গৌরী কখনো আঁতকে উঠেছে। ভয়ে আমার হাত চেপে ধরে চোখ বুজেছে। আবার প্রাকৃতিক শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে হাততালি দিয়ে উঠেছে। পথে রুদ্রপ্রয়াগে একটা রাত আমরা কাটিয়েছি। থাকতে হয়েছিল পথের পাশের এক দোকানের অর্ধ-সমাপ্ত দোতলার ঘরে। প্রচণ্ড গরম ছিল সে দিনটি। আকাশে মেঘের কোনো চিহ্ন ছিল না। ফলে সবাই গরমে ঘেমে নেয়ে একসার। সারা রাত গৌরী আর আমি বসে গল্প করেছি।

পূব আকাশে সিঁদূরের প্রলেপ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রপ্রয়াগের যাত্রীরা জেগে উঠেছিল। পথের ধারে শুয়ে-থাকা মানুষগুলো পরম তীর্থযাত্রার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বাসগুলো হর্ন বাজিয়ে স্টার্ট দিয়ে যাত্রার সূচনা করছিল।

গৌরী আমার কোলে মাথা রেখে চোখ বুজে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওকে জাগিয়ে দিতেই চোখ মেলে বলল, রাতটা যেন বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল।

বল কি ? এই অসহ্য গরমে বাড়ির ছাদে বসে ঘেমে নেয়ে ওঠার পরও এ কথা বলছ ? বাস চললে তবু কিছুটা হাওয়া পাওয়া যাবে।

তা ঠিক। কিন্তু এমন রাতটা কি আর পাব ?

গৌরীর চোখে কিসের এক,ছায়া কাঁপল যেন। শেষের কথায় ওর কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে এল।

বললাম, পাবে না ভাবছ কেন ? পেতেও তো পারি।

আমি আশা করি না। যা কিছু স্বপ্ন দেখি সবই কেমন যেন দুঃস্বপ্ন হয়ে ওঠে। তাই আশা করা ছেড়ে দিয়েছি। যা পাই তা আর হাত ছাড়া করতে ভয় হয়।

গৌরীর চুলে বিলি কেটে বললাম, আমায় বিশ্বাস করতে পার।

গৌরী আমার হাতটা পরম নির্ভয়ে টেনে নিয়ে বুকের মধ্যে চেপে ধরল। অনুভব করলাম, ও যেন আশ্রয় খুঁজছে।

শোনপ্রয়াগের কঠিন ভাঙাচোরা চড়াই পথ শেষ হল একসময়।

গৌরী ক্লান্ত। আমিও ক্লান্ত অবসন্ন। ওর ভারী দেহ এতটা পথ বয়ে আনার ফলে নিজের দেহের সামর্থ সহ্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে। ঘন ঘন শ্বাস নেওয়ার ফলে হাঁপাচ্ছি দারুণ। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে লাগছে। সব কেমন যেন দুলছে। আমিও দুলছি।

মুণ্ডুকাটা গণেশ মন্দিরের সামনে মাথা-ঝাঁকড়া শিরিষ গাছের ছায়ায় বসলাম। তাতেও শান্তি নেই। অসহ্য এক কষ্ট। মনে হচ্ছে প্রাণপাখি বুকের খাঁচা ছিঁড়ে-খুঁড়ে বেরিয়ে আসবে এখুনি। শুয়ে পড়লাম ধূলি-শয্যায়।

সম্বিত ফিরল অনেক বাদে। কানে এলো, বাবুজী গরম চায় পি লো, তবিয়ত ঠিক হো জায়গী।

চোখ মেলে দেখলাম, আমার মুখের কাছে হুমড়ি খেয়ে বড় বড় টানা চোখে শংকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গৌরী। পাশে চায়ের গ্লাস হাতে গাড়োয়ালী এক দোকানী।

কেমন লাগছে?

কিছুটা ভাল।

গৌরী চায়ের গেলাস নিয়ে আমার সামনে ধরে বলল, এটা খেয়ে নাও। স্টিমুলেণ্ট।

উঠে বসলাম। চায়ের গেলাস ধরতে গেলাম। গৌরী হাত সরিয়ে দিয়ে গেলাস আমার ঠোঁটে ধরে বলল, আমি খাইয়ে দিচ্ছি।

আমায় দাও। আমি নিজে খেতে পারব।

দোকানী হঠাৎ বলে বসল, মেমসাব যখন খাইয়ে দিচ্ছেন তখন আপত্তি করবেন না সাব।

গৌরী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দুষ্টু হেসে বলল, ঠিক বলেছে। এখন খাও দিকিনি।

চা খেয়ে সত্যি শরীরের হারিয়ে যাওয়া শক্তি আবার ফিরে পেলাম। বেশ ফ্রেস মনে হল।

আরো খানিক বিশ্রাম নিয়ে গৌরীকুণ্ডের পথে চললাম।

এ পথ বেশ ভাল। চড়াই উৎরাই মেশান। চড়াইতে যে পরিশ্রম হয়, উৎরাইতে আবার তা উশুল হয়ে যায়। সমস্ত পথটি অরণ্যাবৃত। পাইন দেওদার আর কিছু রডোডেনড্রনের গভীর অরণ্যলোক। অনেক নাম-না-জানা গাছগাছালির ভিড় অরণ্য-অভ্যন্তরে। গাছের গায়ে পরভোজী লতা। নানা রঙের ফুল ফুটে আছে সেই সব লতায় ডালে ডালে। সারা পথে বন-গোলাপের জঙ্গল। থরে থরে লাল সাদা গোলাপী গোলাপ ফুটে আছে। ওদের বুকে বন্য এক গন্ধ—মাথা ধরিয়ে দেয়। গন্ধহীন গোলাপের কেবল রূপের বাহার। গোলাপ ছাড়া নানা জাতের পপিফুল নানা রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে অরণ্যভূমি।

গৌরী ছেলেমানুষের মতো একবার পথের এধার একবার ওধারে ছুটোছুটি করে ফুল তুলছে। সংগ্রহ করছে নানা রঙের গোলাপ আর পপি। নতুন ফুল পেলেই ডাকছে আমায়। দেখাচ্ছে।

ফুল তুলতে পথ চলতে সময় কোথা দিয়ে কেটে যায়। পথও শেষ হয়ে যায় এক সময়। অদূরে পাহাড়ের গায়ে ভেসে ওঠে পাহাড়ী গ্রাম। কাঠের দোতলা একতলা বাড়ি সারিবন্দী। পথের ডান দিকে দেবী পার্বতীর প্রাচীন মন্দির।

গৌরী জিজ্ঞেস করে, এ কোন গ্রাম?

বলি, এই তো গৌরীকুণ্ড চটি।

বাঃ চমৎকার! অরণ্যের মধ্যে এমন সুন্দর চটি লুকিয়ে ছিল?

হিমালয়ের গহনে তাই থাকে।

নাঃ, তোমার হিমালয় দেখছি সত্যি সুন্দর।

আমার কেবল? তোমার নয়?

গৌরী আমার হাতে চাপ দিয়ে বলল, আমার তোমার সবার হিমালয়। তারপর হো-হো করে হেসে ফেলল। কেমন, ঠিক নকল করেছি তো?

কথাটা একদিন ওকে বলেছিলাম। আমার সুর নকল করে আমার কথাটাই বলল।

হিমালয় এখন ভাল লাগছে কি-না? মনে পড়ে, বলেছিলে মায়ের জন্য এ পথে এসেছ। না হলে হরিদ্বারে হর-কী-পৈড়ির তীরে বসে সময় কাটিয়ে দিতে।

গৌরী বলল, তখন কি জানতাম হিমালয় এত ভাল এত গভীর!

পাথর বাঁধানো উৎরাই পথে নেমে এলাম উষ্ণকুণ্ডের কাছে। কুণ্ডের সামনে একটা মেঠাইয়ের দোকানে গৌরীর মা বসে আছেন। ওঁর স্নান পুজো সারা হয়ে গেছে। ডাণ্ডিওলারা অদূরে বসে ধূমপান করছে, বিশ্রাম করছে।

গৌরী মায়ের শরীরের খবর নিল আগে। তারপর জিজ্ঞেস করল খেয়েছে কি-না।

গৌরীর মা মাথা নেড়ে জানালেন খাওয়া হয়নি। তারপর আমায় জিজ্ঞেস করলেন, বেটা, আজ কি আমরা এখানে থাকব, না কেদারনাথজী চলে যাব?

বললাম, না, আজ রামওয়াড়ায় রাত কাটাব। কাল সোজা কেদারনাথ যাব ওখান থেকে।

এখান থেকে কতটা পথ রামওয়াড়া?

মাইল চারেক হবে।

তা হলে তো তোমরা স্নান করে নিতে পার। শুনলাম, এরপর নাকি আর স্নান করা যাবে না। খুব ঠাণ্ডা।

আমি স্নান করব। কিন্তু গৌরী কি নামবে ওই জলে?

কেন বেটা? জল তো বেশ পরিষ্কার। ওকে বল স্নান করে নিতে। শরীর ঝরঝরে হয়ে যাবে।

কুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে স্নান করা দেখছিল গৌরী। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, স্নান করবে তো?

করলে ভাল হত। কিন্তু বড্ড গরম জল। তুমি করবে তো?

করব। গরম হলেও আরাম পাবে স্নান করে।

গৌরী আশপাশে নজর বুলিয়ে বলল, সবাই দেখছি এখানেই কাপড় ছাড়ছে। এই ভিড়ে কাপড় বদলানো যায়? একটা ঘর পেলে ভাল হত।

মেঠাইওলাকে বলে ওর একটা ঘরের দরজা খুলিয়ে নিলাম। গৌরীকে কাপড় বদল করে তাড়াতাড়ি চলে আসতে বললাম।

গৌরীকুণ্ড। সত্যযুগে দেবী গৌরী ঋতুস্নান করেছিলেন এই কুণ্ডে। এ কারণে কুণ্ডের নাম গৌরীকুণ্ড। পিছনেই দেবীর মন্দির। পাশ দিয়ে মন্দাকিনীর হিমশীতল স্রোতধারা বয়ে গেছে। অনেকেই মন্দাকিনীতে স্নান করে এসে গৌরীকুণ্ডে স্নান এবং দান করছে।

আগের দেখা গৌরীকুণ্ডের অনেক পরিবর্তন হয়েছে ইদানীং। চৌহদ্দিতে আগে কোনো দোকানপাট ছিল না। পূজারী পাণ্ডা এবং ফুলের সাজি নিয়ে বসা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা থাকত এখানে। যাত্রীরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কুণ্ডের তীরে কাপড়চোপড় ছেড়ে স্নান করতে নামত। তারপর এখানেই কাপড় বদলে ফোঁটা-তিলক কেটে পুজো দিয়ে মন্দিরে যেত। এখন কুণ্ডের চত্বরে মেলা বসে গেছে। হাজারো মানুষের ভিড়। আগের স্নানে কি এক মাহাত্ম্য ছিল যা আজ আর নজরে পড়ে না। কিসের যেন এক অভাব দেখি তীর্থপথে। অভাবটা ভক্তির না অন্য কিছুর তা ঠিক বুঝতে পারি না।

কুণ্ড থেকে বাষ্প উঠছে। একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ। কুণ্ডের তীরে

বসে উত্তপ্ত জলে পা ডুবিয়ে সহ্য করছি। ক্রমেই উত্তাপ সয়ে যায়। ধীরে ধীরে নেমে পড়ি জলে। জ্বালা করে ওঠে সারা দেহ। আবার উঠে আসি সিঁড়ির ওপর।

এই, জল খুব গরম নাকি! উঠে এলে যে বড়?

গৌরীর গলা শুনে পিছন ফিরে তাকালাম! একটা স্লিপিং গাউন পরে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে। ওটা গায়ে দিয়ে স্নান করবে না-কি? মন্দ নয়। মেয়েরা এই খোলা জায়গায় স্নান করার সময় আব্রু বাঁচাতে পারে না। অবশ্য সব মেয়েই প্রায় শায়া আর ব্লাউজ পরে স্নান করছে। দু' চারটে বাঙালী মেয়ে ছাড়া সবারই ওই স্নানের পোষাক। বাঙালী মেয়েদের তবু লজ্জা সরমের কিছু বালাই আছে। পাঞ্জাবী, মহারাষ্ট্র আর গুজরাটের মেয়েদের ওসব বালাই নেই। ফলে আমাদেরই লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে থাকতে হয়। গৌরীর তবু বাঙালী মেয়েদের মতো লজ্জা আছে দেখে ভাল লাগল।

গৌরী এসো।

কয়েক ধাপ নেমে এসে গৌরী বলল, জল খুব গরম না?

তা একটু গরম বটে। জলে নামলে সয়ে যাবে। চলে এসো।

গৌরী হঠাৎ স্লিপিং গাউন খুলে ফেলল।

ওর পোষাক দেখে থতমত খেলাম। একটা প্যান্টি আর চাপা হাওয়াই সার্ট। পোষাকটি ওর দেহে চেপে বসেছে। ফলে ওর সুললিত দেহ-মঞ্জরীর কানায় কানায় ভরা যৌবন যেন চলকে পড়ছে। যেমন গায়ের রঙ তেমন স্বাস্থ্যশ্রী। আগুনের মতো রূপ। এ যেন মুহূর্তের দহনে ক্ষত-বিক্ষত করে দেবে। গৌরী যেন পাথর-প্রতিমা। নিটোল দেহ মনে হয় কোনো ভাস্করের তৈরি। আমি অবাক বিস্ময়ে অপলক তাকিয়ে আছি ওর দিকে।

স্লিপিং গাউন সিঁড়ির শুকনো জায়গায় রেখে গৌরী আমার পাশে এসে বসল। স্নানার্থী পুরুষ-নারী সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে। তারা বুঝি স্নান ভুলে গেছে। আমিও বাকরুদ্ধ—স্তব্ধ।

গৌরী সুডৌল পায়ের পাতা জলে ডুবিয়েই অস্ফুট কাতরোক্তি করল। তারপর বলল, এত গরম! পা দুটো জ্বলে গেল।

ডুবিয়ে রাখ দেখবে সহ্য হয়ে গেছে।

গৌরী আবার পায়ের পাতা, শেষে পা দুটো গরম জলে ডুবিয়ে দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল। স্বচ্ছ উষ্ণ জলের মধ্যে ওর শ্বেত পাথরের মতো পা দুটো ক্রমে লালচে হয়ে উঠছে। এবার বুঝি রক্ত ঝরে পড়বে!

আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে গৌরী বলল, অমন হাঁ করে কি দেখছ?

দেখছি তোমাকে।

আগে দেখনি? নতুন দেখছ বুঝি?

এ রূপে দেখিনি।

এর আবার দেখার কি আছে?

দেখার মতো বলেই তো দেখছি।

তোমার সব তাতে বেশি বেশি। গৌরী যেন কিছুটা ক্ষুণ্ণ হল।

আমি একা দেখছি? চারদিকে তাকিয়ে দেখ। সবাই স্নান ভুলে তোমায় দেখছে।

গৌরী অভিমানের সুরে বলল, আমার নামাই অন্যায় হয়েছে।

অন্যায় হবে কেন? তবে এ পোষাক পরে না এলেই ভাল করতে।

এটা স্নান করার পোষাক। গৌরীর সুরে প্রতিবাদ। অন্যায়টা কোথায়?

অন্যায় তোমার নয়। তোমার চোখ ধাঁধানো রূপ আর আমাদের অবাধ্য চোখই এর জন্য দায়ী।

তুমি বড্ড অসভ্য। আমার দিকে অমনভাবে না তাকালেই হয়।

বললাম তো, আমার অবাধ্য চোখই দায়ী। এমন রূপের ঝলকানিতে কেই-বা চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে।

গৌরী বেশ চটে গেল। বলল, ঠিক আছে আমি উঠে যাচ্ছি। তুমি বললে বলেই স্নান করতে এলাম।

ওর হাত ধরে জলে টেনে নামালাম। বললাম, এসেছই যখন তখন স্নানটা করেই যাও।

উঃ কি ভীষণ গরম জল। গা পুড়ে যাচ্ছে। গৌরীর বুক মুখ লালচে হয়ে গেছে।

বললাম, গলা ডুবিয়ে খানিক থাক, দেখবে গরম কম লাগছে।

একবার গলা পর্যন্ত ডুবিয়েই প্রায় লাফিয়ে উঠল। না বাবা, এ জলে স্নান করতে পারব না।

গৌরী সিঁড়িতে উঠে পড়ে। ওর গা-চাপা পাতলা পোষাকের দিকে শত শত লোলুপ চোখের তীক্ষ্ণ চাউনি। অস্বস্তি বোধ করি আমি। অথচ গৌরীর কোনো হুঁস নেই। স্লিপিং গাউনটা ওর হাতে দিয়ে বলি, চটপট গা ঢেকে নাও। ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

গৌরী স্লিপিং গাউন গায়ে জড়িয়ে নিয়ে কঠিন কটাক্ষ করে ঘরে চলে গেল। ওর চলার পথেও জোড়া জোড়া চোখ ধাওয়া করল।

গৌরীকে যত দেখছি ততোই অবাক হচ্ছি। নিজে সুন্দরী তন্বী যুবতী এ কথা কি ও জানে না? ওর রূপের আগুন যে কোনো বয়েসের পুরুষের রক্তে মাতন ধরায় তা কি ও বোঝে না? স্কুল কলেজে পড়েছে ছেলেদের সঙ্গে পাশাপাশি। লাজুক রথীন বোসের সঙ্গে একসময় মধুর সম্পর্ক ছিল ওর। কলেজের বয়-ফ্রেণ্ডরা কি সবাই রথীন বা আমার মতো বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে ওর জ্বলন্ত রূপ দেখেও? নাকি ও নিজের রূপ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন এবং আমায় পরীক্ষা করছে!

হিমালয়ে এসে এমন অভিজ্ঞতা হয়নি কখনো। ভ্রমণ-পথে অনেক মানুষ দেখেছি। তাদের কেউ সমতল শহরের, কেউ নিভৃত গ্রামের, কেউবা হিমালয়ের গহন-নির্জনের। মিশেছি তাদের সঙ্গে আন্তরিক ভাবে প্রাণ খুলে। বন্ধুত্ব হয়েছে অনেকের সঙ্গে। কারো

কারো মনের গভীরেও প্রবেশ করতে পেরেছি। কারো বা হৃদয়ের বেশ কিছুটা দখলও করেছি। কিন্তু গৌরীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক যে দিকের ইংগিত দিচ্ছে তা যতই লোভনীয় হোক না কেন—শোভন নয়।

…ঋষিকেশে থাকার সময় একটা দিনের কথা মনে পড়ছে। সেদিন সন্ধ্যায় আমরা চন্দ্রেশ্বর শিবের মন্দিরের সামনে নির্জন গঙ্গার তীরে বসেছিলাম। কথা হচ্ছিল রথীনের শাইনেস সম্বন্ধে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, গৌরী তোমার খুব সাহস, তাই না?

গৌরী হেসে জিজ্ঞেস করেছিল, কেন বলতো?

মানে, ছেলেদের সঙ্গে তুমি সহজে মেশ সেইজন্য বলছি। সাহস না থাকলে সব ছেলের সঙ্গে মেশা যায় না।

গৌরী বলল, ছেলেদের সঙ্গে মেশায় সাহসের আবার কি আছে?

দিল্লী আর পাঞ্জাবের ছেলেদের সম্বন্ধে নানা কথা শুনি। তারা খুব ডেয়ারিং। মেয়েরা নাকি ওদের ভয়ে একা পথে বেরতে ভয় পায়।

কথাটা আমিও শুনেছি। তবে ওসবে আমার ভয় নেই। কারণটা কি জান?

কি?

আসলে আমি কোনো ছেলেকেই অবিশ্বাস করি না। কোনো পুরুষের কাছে ভয়ের কিছু আছে বলে মনে করি না।

কি করে বুঝলে? ভয়ের তো থাকতেও পারে।

কি থাকতে পারে বল?

নির্জন এই নদীর তীরে আমার মতো একটা পুরুষের পাশে বসে আছ যাকে তুমি এখনো ভালভাবে চেন না। হঠাৎ যদি কোনো অঘটন ঘটিয়ে ফেলি? তখন চিৎকার করেও তো কারো সাহায্য পাবে না। এ রকম অবস্থায় তুমি আমার মধ্যেও কোনো ভয়ের কারণ পাবে না?

গৌরী আমায় চিমটি কেটে বলল, শয়তানীর মতলব আঁটছ নাকি ?

আঁটতেও তো পারি। আমি তো পুরুষ।

আর কেউ পারে কিনা জানি না। তবে তুমি পার না। আমার মানুষ চিনতে ভুল হয় না। গৌরী খানিক চুপ করে থেকে বলল, যারা বিশ্বাসের মর্যাদা না দেয় তাদের আমি অন্তর দিয়ে ঘৃণা করি।...

গৌরীর সেদিনের কথা আজও আমার কানে বাজছে।

জীবনে নানা বিপর্যয়ে পড়েছি। দুঃখও কম পাইনি। ভালবাসা যেমন পেয়েছি তেমন আবার হারিয়েছি। হারানোর দুঃখ পেয়েছি বটে, সহ্যও করেছি। কিন্তু ঘৃণা সহ্য করতে পারব না। আজকের ব্যাপারটা যদি গৌরীর সরলতা হয় তাহলে বিশ্বাসের মর্যাদা আমায় দিতে হবে। আর যদি পরীক্ষা হয় তাহলেও নিজেকে ছোট করতে পারব না। কারণ গৌরীকে আমি ভালবেসে ফেলেছি।

নিবিড় অরণ্যালোকের মধ্যে পায়েচলা পথ। একটানা চড়াই এঁকে-বেঁকে উঠেছে ওপরে।

বিশাল বিশাল বৃদ্ধ বনস্পতি অগোছালভাবে ঘর-সংসার পেতেছে অরণ্যভূমির চারদিকে। সৃষ্টির কোন আদিলগ্নে ওদের জন্ম। পৃথিবীর বুকে অংকুরিত হয়ে আলোর সন্ধানে সেই যে আকাশ পানে মুখ তুলে তাকিয়েছিল, সে চাওয়া আজও শেষ হয়নি। বৃদ্ধ হলেও ওদের আলোর পিপাসা মেটেনি। সারা আকাশ আবৃত করে শত-সহস্র ডালপালা পত্র-পুষ্প বিস্তার করে ওরা আলোর পিপাসা মেটাচ্ছে।

এ অরণ্য প্রধানত দেবদারু আর রডোডেনড্রনের। দেবদারুর নিবিড় ছায়ায় রডোডেনড্রন বাড়তে পারেনি তেমন। কিন্তু পাহাড়ের

ধারে খাদের আর ঝরনার পাশে যেখানে আকাশের মুখ দেখেছে সেখানেই তরতর করে ওরা বেড়ে উঠেছে। সাদা হলুদ লাল নীল আরো পাঁচমিশেলি রঙের ফুল ফুটিয়ে অরণ্যের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে নিঃশব্দ আলোড়ন এনেছে।

গৌরী আর আমি হাঁটছি পাশাপাশি। কারো মুখে কোনো কথা নেই। চড়াই থাকায় পথ চলতে কিছু কষ্ট হলেও শান্ত অরণ্য-লোকের নির্জন পরিবেশে ভালই লাগছে হাঁটতে।

অরণ্যের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে গৌরী বলল, আমার ওপর রাগ করেছ?

অবাক হলাম ওর কথায়। কিসে রাগ করব ভেবে পেলাম না। বললাম, কই, নাতো!

গৌরীকুণ্ড থেকে বেরুনো পর্যন্ত একটা কথাও বলোনি তো।

ওঃ, এই জন্যে? গৌরীর একটা হাত আমার হাতের মুঠোয় নিয়ে বললাম, এমন নির্জনে কথা বললে যে নির্জনতা নষ্ট হবে। তোমার কথাই ভাবতে ভাবতে চলেছি।

আমার কোন কথা? গৌরীকুণ্ডে স্নান করা?

কি করে বুঝলে?

আমার স্নানের পোষাক তোমার ভাল লাগেনি বলেই মনে হল তুমি রাগ করেছ।

না, রাগ করিনি। তবে ওই স্বল্পবাসে আর পাঁচজনে তোমায় ওভাবে দেখুক এটাই কেবল আমার ভাল লাগেনি। তুমি লক্ষ্য করনি, লোকগুলো তোমায় গিলছিল।

গৌরী আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, রথীন আর তুমি দেখছি একই! সব বাঙ্গালীরা কি তোমাদের মতন?

কি রকম?

মানে, কেবল নিজে দেখব, নিজে উপভোগ করব। অপরে

দেখলেই রাগ হবে? ওদের দেখার ফলে কি আমি অপবিত্র হয়ে গেছি? আমার কি খোয়া গেছে বল?

হেসে ফেললাম গৌরীর কথায়। ওর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললাম, উপভোগ আর করলাম কই? তোমার আগুনের মতো চেহারার দিকে তাকিয়েই আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে।

গৌরী মনে মনে খুশি হয়েছে মনে হল। মুখ লাল করে বলল, বড্ড মিছে কথা বল। আমার চেহারায় মোটেই ওসব নেই।

তাহলে বলতে হয় তুমি নিজেকে দেখনি।

থাক, খুব হয়েছে।

গৌরী নীরব হয়ে গেল।

শান্ত প্রকৃতির সীমাহীন নীরবতা আমাদের দু'জনকে মুহূর্তে গ্রাস করে ফেলল। কেবল দু'জোড়া পায়ের নিচের শুকনো পাতায় মর্মর ধ্বনিই সজীব হয়ে রইল।

পাহাড়ী বাঁক ঘুরে ঘুরে উঠছি। অরণ্য ক্রমে গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। গাছের ঝরা পাতায় মাটি দেখা যায় না। পুরু গালচের মতো শুকনো পাতার ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছি। অদূরে ঝরনার রিমঝিম শব্দ শোনা যাচ্ছে।

গৌরী হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। কি হল ওর! তাকালাম ওর মুখে। বিশ্রাম নিতে চায় নাকি? জিজ্ঞেস করলাম, বসবে?

আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে ইশারায় দূরের দিকে দেখাল।

এক দঙ্গল পাখি খেলা করছে। কিছু রডোডেনড্রন গাছের ডালে নাচছে, কিছু মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে, আবার কিছু পাখি খেলা করছে। ওগুলো হিমালয়ান প্যারট। বিচিত্র ওদের গায়ের রঙ আর লম্বা লম্বা চেহারা।

পা টিপে টিপে এগিয়ে একটা পাথরের ওপর গৌরী বসল। আমি বসলাম ওর পাশে।

মাত্র কয়েক গজ দূরে গোলাপ ঝোপের শক্ত ডালে দুটো হলুদ

সবুজ রঙের পাখি দোল খাচ্ছে দেখলাম। বিচিত্র শব্দ করে আলাপচারি করছে ওরা। মাঝে মাঝে দু'জনে দু'জনের ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকাচ্ছে। খুশিতে লেজ নাড়ছে।

গৌরী আড়চোখে আমার দিকে তাকাল। আমিও দেখছি দেখে হাসল। তারপর কানের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করল ফিসফিস করে, ওরা কি বলছে বলতো?

কি করে বলব। তুমি পাখির ভাষা বোঝ?

চেষ্টা করলে তুমিও বুঝবে।

কি বলছে ওরা? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

অদ্ভুত হেসে গৌরী বলল, ওরা ভালবাসার কথা বলছে।

কি করে বুঝলে?

গৌরী আবার সেই রকম হেসে বলল, দেখছ না, অন্য পাখিগুলো মাটি থেকে ফুল থেকে পোকামাকড় মধু খাচ্ছে। জৈবিক কাজে ব্যস্ত। কিন্তু গোলাপের ডালে বসে ওরা কিছুই খাচ্ছে না। কেবল দোল খাচ্ছে আর বকেই যাচ্ছে। ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকাচ্ছে লেজ নাড়ছে। আবার বকছে। ভালবাসার কথা ছাড়া আর কিছুই কইছে না ওরা।

গৌরীর কথা শেষ হয়নি মনে হল আমার। তাই চুপ করে থেকে ওকে আরো কিছু বলার সুযোগ দিলাম।

গৌরী বলল, জান, ভালবাসার কথা বলার সময় ক্ষিদে তৃষ্ণা লোকভয় কিছুই থাকে না। হৃদয়ের আবেগ লৌকিক সব কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যে ভালবাসে সে নির্ভীক।

পাখি দুটোর ভালবাসাবাসির দিকে অপলক তাকিয়ে রইল গৌরী। ওর মন এ মুহূর্তে কোন স্মৃতির ডানায় চেপে কোথায় যে উধাও হয়েছে তা ওই জানে।

তুমি কাউকে ভালবেসেছ কখনো?

গৌরীর অনুচ্চকণ্ঠের প্রশ্ন শুনে মনের মধ্যে দোলা লাগল আমার। যে কথা আজ কদিন ওকে মুখ ফুটে বলতে পারিনি সে

সুযোগ এসেছে। আমার ভালবাসার কথা ওকি জানে? নাকি জানতে চাইছে? দোলা খাওয়া মনটাকে শাসন করলাম। বুকের মধ্যে একটা প্রত্যাশাকে যন্ত্রণায় পরিণত করলাম। মনে মনে ভাবলাম, যে প্রশ্নের জবাব সোজা তা পরিবেশের কারণে কঠিনও হতে পারে। গৌরীর মনের খবর এখনো পাইনি। এ যদি ওর খেলা হয়, যদি নিছক বন্ধুত্ব হয়—তা হলে যে ব্যথার ভার বাড়বে। জবাব দেওয়ার চেয়ে চুপ থাকা ভাল।

গৌরী প্রশ্নের জবাব না পেয়ে আমার মুখ থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, কাউকে ভালবাসলে বুঝতে পারতে পাখি দুটি কি বলছে।

এবার আমার প্রশ্ন করার পালা। গৌরীর মন আমার জানতে হবে, ও কি চায়। বললাম, তুমি বুঝি কাউকে ভালবাস?

গৌরী পাখি দুটির দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, বাসতাম একজনকে।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এখন?

গৌরী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, এখন যাকে ভাল লাগে তাকে।

কে সেই ভাগ্যবান পুরুষ?

পরে শুনো।

তাহলে তোমার প্রথম ভালবাসার মানুষটির কথা বল।

তার কথা নাই-বা শুনলে।

কিন্তু তার অপরাধটা কি ছিল যা তোমার মতো মেয়ের ভালবাসা হারাল?

অপরাধ নয়। অবিশ্বাস আর ভুল বোঝাবুঝি। গৌরী উদাস সুরে বলল।

ও দুটো তো তুমি ভাঙ্গিয়ে দিতে পারতে।

তা পারতাম। কিন্তু তাতে নিজেকে ছোট করে ফেলতাম।

ভালবাসায় কি কেউ কখনো ছোট হয় গৌরী ?

তা হয়তো হয় না। তবু…

এটা তোমার অভিমান।

হবে হয়ত।

হঠাৎ পাখিগুলো ভীত চকিত। ডানা ঝাপটে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে গাছ মাটি ফুলের বুক থেকে আকাশে উড়ল। তারপর গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আশেপাশে তাকিয়ে দেখলাম চারজন ডাণ্ডিওয়ালার কাঁধে চেপে এক বৃদ্ধা চলে গেল অরণ্যের গভীরে। তাদের পায়ের শব্দে সচকিত পাখির দল উড়ে গেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য, ভালবাসার কথা বলা সেই হলুদ সবুজ রঙের পাখি দুটির কিন্তু কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। গোলাপের ডালে বসে লেজ নাচিয়ে মাথার ঝুঁটি দুলিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকিয়ে কিচমিচ শব্দে ভালবাসার কথা বলেই চলেছে।

গৌরীর কাঁধে হাত রেখে পাখি দুটির পাশকাটিয়ে যাবার সময় বললাম, গৌরী, তোমার কথাই ঠিক। ভালবাসা ভয়কেও গ্রাহ্য করে না দেখছি।

গৌরী আমার মুখে তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হাসল।

রামওয়াড়ায় যখন পৌঁছলাম তখন অপরাহ্ণবেলা গড়িয়ে গেছে।

পাহাড় পর্বতের আড়ালে সূর্য মুখ লোকানোর ফলে আলো থাকলেও ঠাণ্ডা প্রচণ্ড। সূর্য অস্ত গেলেই উত্তরে হাওয়া বইবে। তখন হাড়ে কাঁপুনী ধরিয়ে দেবে।

নতুন তৈরি একটি বাড়িতে দোতলায় একখানা ঘর পেয়েছি। মাঝারী ঘর। দুটো খাটিয়া। নিচে দড়ির তৈরি গালচে পাতা। ঘরের সামনে এক টুকরো কাঠের ফেনসিং দেওয়া বারান্দা। দুটো

চেয়ার পাতা আছে। নতুন বাড়ি তাই ইলেকট্রিক কানেক্‌শন আসেনি। অন্ধকার ঘরের কুলুঙ্গিতে দুটো মোমবাতি জেলে দেওয়া হয়েছে।

গৌরীর মা বিশ্রাম করছেন চেয়ারে। ডাণ্ডিতে এলেও সারাপথে বসে থাকার ধকল আছে। মুখচোখে ওঁর ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট।

গৌরী ষ্টোভ জেলে চা বানাচ্ছে। আমি খাটিয়া দুটো বার করে দিয়ে বিছানা পাতার কাজে লেগে গেলাম। গৌরী আর ওর মায়ের জন্য খাটিয়া দুটো ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম। গৌরী আপত্তি করেছে। বলেছে, আমরা খাটিয়ায় শোব আর তুমি কোথায় শোবে। ঘরের বাইরে? তা হবে না। শুলে সবাই খাটিয়ায় শোব, না হলে সবাই মেঝেতে বিছানা করে শোব।

গৌরীর মা সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে আমাকে খাটিয়া দুটো বাইরে বার করে দিতে বলেছেন। মা-মেয়ের কথা মতোই দুটো হোল্ডঅল খুলে দুটো আলাদা বিছানা পাতলাম। একটায় গৌরী আর ওর মা, অপরটায় আমার শোবার ব্যবস্থা।

বিছানা পেতে বারান্দায় গৌরীর মায়ের পাশে এসে বসলাম।

নিচেই পথ। এ পথটাই এঁকে-বেঁকে কেদারনাথ চলে গেছে। দু'দিক থেকেই যাত্রীরা আসছে। কেউ কেদারনাথ দর্শন করে ফিরছে কেউবা কেদারনাথের যাত্রী। রাতের ডেরা এই রামওয়াড়াতেই করবে সবাই। আসন্ন সন্ধ্যায় আর কেউই এগোবে না। যারা কেদারনাথ থেকে ফিরছে তাদের মুখে অদ্ভুত এক তৃপ্তি। প্রাপ্তির আনন্দে উজ্জ্বল তাদের ক্লান্ত মুখগুলো। আর যারা কেদার যাত্রী তাদের চোখে মুখে বিস্ময়। অধরাকে ধরার আকাঙ্খা।

ওই সব মুখ আমার চেনা। বার বার এপথে এসে ওদের মুখ আমার চেনা হয়ে গেছে। এক যুগ আগে যে তৃপ্তি যে আকাঙ্খার রেখা দেখেছি আজও তা অবিকৃত আছে। সব কালের সব হিমালয় তীর্থযাত্রীর মানসিকতাই এক! তাই বুঝি এ-যাত্রা পুরনো হয় না।

চলমান এই স্রোতের শেষ হয় না। যে একবার আসে সে বার বার আসে। তাকে বার বার আসতে হয় হিমালয়ের আকর্ষণে।

গৌরীর মাকে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন লাগছে মাতাজী?

মাতাজী বললেন, খুব ভাল বেটা। বরং ক্ষেদ হচ্ছে আগে আসিনি কেন। কর্তা কতবার আমায় বলেছিলেন, চলো কেদারনাথ বদরীনারায়ণজী ঘুরে আসি। আমি গা দিইনি। বলেছি, এত জায়গা থাকতে কেদার-বদরী কেন যাব? তার চেয়ে চলো সাউথ ইণ্ডিয়া ঘুরে আসি। কেপ্-কমোরিন চার্মিং। এখন দেখছি কত ভুল করেছি। পায়ে হেঁটে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা কি লোকের কাঁধে চড়ে পাওয়া যায়?

মাতাজী নিচের পথে মানুষের যাওয়া আসার দিকে তাকিয়ে বললেন, পায়ে হাঁটায় অনেক সুখ। তীর্থের আনন্দ পাওয়া যায়। মাতাজী একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

দুঃখ করে কি লাভ মাতাজী? তবু তো এসেছেন আপনি। কত মানুষ এখনো জানে না এ তীর্থের কথা।

হ্যাঁ বেটা, তা ঠিক। সেদিক দিয়ে আমি ভাগ্যবতী। কর্তা মারা যাওয়ার পরই আমার কেদার-বদরী তীর্থের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। গত বছরই আসতাম। পারিনি কেবল গৌরীর জন্য।

গৌরী বুঝি আসতে চায়নি?

হ্যাঁ। এবার তো ওকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল কেদার-বদরী দর্শন করা। ওকে কিন্তু বলিনি একবারও। দেরাদুন্ মুসৌরী হরিদ্বার ঘুরে ঋষিকেশ এসে মনের কথা বললাম। আমার কথা শুনে মেয়ে চটে লাল। বলে, এত জায়গা থাকতে কেদার-বদরী কেন? আমি যাব না। আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা হয়ে বসে থাকলাম। শেষে তোমার সঙ্গে আলাপের পর দেখলাম ওর মত বদল হয়েছে। আসলে তোমার জন্যেই এ তীর্থ হল বেটা।

হেসে বললাম, তা নয়। আপনার ভাগ্যে কেদার-বদরী দর্শন ছিল। তাই…

সে তো বটেই। তা হলেও তো একটা উপলক্ষ্য আছে। তুমিই উপলক্ষ্য। বৃদ্ধা খানিক চুপ করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে পিছন ফিরে দেখলেন গৌরী ঘরে চা বানাচ্ছে। নিচু গলায় বললেন, গৌরী যে শেষ পর্যন্ত কেদার-বদরী আসতে চাইবে ভাবতেই পারিনি। তাছাড়া ও যে তোমাকে পছন্দ করেছে সেটাও একটা বিস্ময় আমার কাছে।

বিস্ময়ের কারণ কি জানি না। ওর স্বভাবের অস্বাভাবিক অনেক কিছু নজরে পড়েছে আমার। তাই বিস্ময়ের কথা শুনে জিজ্ঞেস করলাম, কেন, বিস্ময়ের কি আছে ?

আচ্ছা বেটা, রথীনের কথা কিছু বলেছে তোমায় ?

বলেছে, তবে খুবই সামান্য।

বৃদ্ধা আড়চোখে গৌরীকে দেখে নিয়ে আরো নিচু গলায় বললেন, গৌরীর সঙ্গে রথীনের মেলামেশা ছেলেবেলা থেকে। স্কুলে পড়ার সময় থেকে। পড়াশুনাও করেছে দুজনে এক সঙ্গে। ওদের বাবারা খুব বন্ধু ছিলেন। এক অফিসের অফিসার ছিলেন। থাকতাম আমরা পাশাপাশি কোয়াটার্সে। কর্তা মারা যাবার পর রথীনের বাবা আমাদের নিয়মিত দেখাশোনা করেছেন। এখন তিনি রিটায়ার করে কলকাতায় চলে গেছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, কলকাতায় কি ওঁদের বাড়ি আছে ?

হ্যাঁ। নিজেদের বাড়ি। যাওয়ার সময় গৌরীকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। বৃদ্ধা গলাটা আরো খাটো করে বললেন, রথীনের সঙ্গে গৌরীর বিয়ের কথা হয়েছিল।

মনে মনে চমকালাম। একটা আঘাতও যেন লাগল মনের কোথাও।

গত মাসেই সব হয়ে যেত। গৌরীও কলকাতায় চলে যেত। কিন্তু বাবা কি যে হল বুঝলাম না।

বিয়ে ভেঙ্গে গেছে নাকি ?

কথা তো হয়েই ছিল। কিন্তু যাদের বিয়ে তাদের মনের হদিশ পাই না। রথীনের সঙ্গে গৌরীর কি যে হল বুঝিনা।

জিজ্ঞেস করেছিলেন ?

হ্যাঁ বাবা। কিন্তু কিছুতেই ওদের মুখ থেকে কথা বার করতে পারিনি। মনোমালিন্যের কারণটা জানতে না পারলে মেটাই কি করে ? অথচ দেখ, গৌরী ওই একটা ছেলের কথায় উঠত বসত। ওর পড়াশোনার জন্য রথীন কম করেনি। মেয়ে আমার যেমন জেদী তেমনই অভিমানী।

গৌরী অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিশত ?

হ্যাঁ। ওর তো গাদা গাদা বন্ধু ছিল। তবে রথীনের মতো তারা কেউ নয়। রথীন হঠাৎ কলকাতা চলে যাবার পর আর কোন ছেলের সঙ্গে মিশতে এমন কি কথা বলতেও দেখি নি। ব্যতিক্রম দেখলাম তোমার বেলায়। রথীনের সঙ্গে যেমন ভাবে মিশত ঠিক তেমন ভাবেই দেখছি তোমার সঙ্গে মিশছে।

গৌরী চা নিয়ে আসায় আলোচনায় ছেদ পড়ল।

চায়ের পেয়ালা হাতে দিয়ে গৌরী মাকে জিজ্ঞেস করল, মায়ে-পোয়ে কি এত কথা হচ্ছিল ? খুব জমেছে তোমাদের তো।

মাতাজী চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে হাসলেন। বললেন, কেন জমবে না শুনি ? ছেলের জন্য আমার তীর্থ হচ্ছে।

গৌরী কপট অভিমানের সুরে বলল, তা তো বলবেই। মেয়েরা সব সময় পর আর ছেলেরা আপন।

তারপরই আমার দিকে তাকিয়ে বলল, রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা হোটেলে করতে হবে। আজ আর রান্না করার মুড নেই।

মাতাজী বললেন, সেই ভাল। যা ঠাণ্ডা। তা হোটেল আছে তো এখানে ?

নিচেই আছে। আমি অর্ডার দিয়ে আসছি।

তাড়াতাড়ি চা শেষ করে বেরিয়ে পড়লাম।

এখনো যাত্রীরা আসছে। ধর্মশালায় ঘুরছে ঘরের জন্য। এবার ভীড়ের চাপ খুব। অনেক নতুন নতুন ঘর বাড়ি হয়েছে। তবু স্থানাভাব। অনেকেই স্থানাভাবে দোকানে আশ্রয় নিয়েছে। দেহাতি যাত্রীরা পথের ধারে পাথর সাজিয়ে রান্না বসিয়েছে। পথের পাশের দোকান ঘরে ভক্ত যাত্রীরা কোথাও মহাভারতের কথা, কোথাও কেদারনাথ মাহাত্ম্য আবার কোথাও গীতা পাঠ শুনছে। ভজন গান আর সংকীর্তনের আসরও বসেছে কয়েকটি জায়গায়।

আনমনে ঘুরতে ঘুরতে চটির শেষ প্রান্তে কাঠের সেতুর কাছে এসে দাঁড়াই। সেতুর নিচ দিয়ে একটা বড় ঝরনা বয়ে গেছে। ঝরনাটি বাঁদিকের পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে এসে মন্দাকিনী নদীতে পড়েছে। চটির পাশেই মন্দাকিনী নদীর ধারা। কেদারনাথ থেকে নদীটা এসেছে।

সেতু পার হয়ে ওপারে চড়াই পথের শুরু। জিগজ্যাগ উঠেছে হাজার ফুট। তারপর পাহাড়ের বাঁদিকের গিরিশিরার গা বেয়ে এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। ও পথই কেদারনাথের।

দিনের আলো ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। রামওয়াড়ায় সন্ধ্যা উৎরে রাতের আঁধার নেমেছে। আকাশে কিন্তু তখনো আলো আঁধারির খেলা চলছে। কনকনে উত্তুরে হাওয়া বইছে। শীতের শিহরণ লাগছে।

আবছা আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার বার বার মনে পড়ছে গৌরীর কথা। রথীনের সঙ্গে ওর সম্পর্কের স্পষ্ট ইংগীত পেয়েছি। ওদের বিয়ের কথা পাকা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়নি। রথীনের সঙ্গে ওর কোথায় যেন মনের অমিল হয়ে যায়। আর তার ফলেই বিচ্ছেদ। কি সেই অমিল? কেন ওদের বিচ্ছেদ হল?

আমার এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে গৌরী। কিন্তু ওকে জিজ্ঞেস

করা যাবে না। হৃদয়ের এ দিকটা মেয়েদের খুবই দুর্বল। কোনো দুর্বল মুহূর্তে যদি নিজের থেকে বলে তবেই জানা যাবে।

কাঁধে মৃদু স্পর্শে চমকে উঠলাম। কে এই প্রায়ান্ধকার সেতুর ওপর আমার কাঁধে হাত রাখল? পিছন ফিরে তাকাতেই দেখি গৌরী দাঁড়িয়ে। গায়ে ওর হালকা একটা শাল জড়ান। মুখ কেমন যেন বিষণ্ণ।

তুমি এই ঠাণ্ডায় আবার বেরলে কেন?

গৌরী নির্বাক আমার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। মনে মনে আশংকা হল, ওর মায়ের কথা শুনতে পেয়েছে নাকি! হৃদয়ের দুর্বল স্থানে আঘাত পেয়েছে কি? নিজেকে সামলে নেবার আগেই গৌরী প্রশ্ন করে বসল, হঠাৎ অমনভাবে উঠে এলে কেন?

মনে মনে থতমত খেয়ে গেলাম। সামলে নিয়ে হাসলাম। বললাম, আর অমনি চিন্তায় পড়ে গেলে আমি রাগ করেছি, তাই না?

তোমাকে নিয়ে আমার সব সময় ভাবনা। পান থেকে চুন খসলেই তো তোমরা রাগ কর। গৌরী আমার কাঁধের ওপর দুটো হাত রেখে মুখোমুখি প্রশ্ন করল, এই বল না, সত্যি রাগ করনি তো?

রাগ করব কেন? রাগের কিছু ঘটেছে?

গৌরী আমার কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, যাক বাবা বাঁচলাম। ভেবেছিলাম রান্না করতে পারব না বলায় বুঝি বাবুর রাগ হয়েছে।

ধুস, ও আবার একটা কথা। বরং আমিই হোটেলে খাওয়ার পক্ষপাতি। এই ঠাণ্ডায় রান্নার ঝামেলা কম?

তুমি তবু এসব কনসিডার কর। রথীন কিন্তু এ ব্যাপারে ভীষণ সিরিয়াস। স্ট্যাণ্ডার্ড হোটেল রেঁস্তোরা ছাড়া কখনো খেত না। আমার কিন্তু অত বাছবিচার নেই। তুমিই বলনা অত বাছবিচার করে বাইরে থাকা যায়?

তোমরা আউটিং করতে বুঝি? সাবধানে প্রশ্ন করলাম।

দু'বার মাত্র ওর সঙ্গে বাইরে ঘুরেছি। একবার মুসৌরী আর একবার আগ্রা। মুসৌরীতে তেমন প্রবলেম হয়নি। সকালে বা রাত্রে যে হোটেলে ছিলাম সেখানেই খাওয়া দাওয়া করেছি। মুশকিল হয়েছিল আগ্রায়। মহারাজা হোটেলে থাকতাম। সারাদিন টো টো করে ঘুরতাম। তাই খাওয়া দাওয়া রাস্তায় হোটেলেই সারতে হত। হোটেল খুঁজতেই ক্ষিদে মরে যেত বেশির ভাগ দিন। সব জায়গায় কি আর স্ট্যাণ্ডার্ড হোটেল পাওয়া যায়?

গৌরী একটানা বলে থামল। আমি নির্বাক শ্রোতা। খানিক বিরামের পর বলল, শেষদিকে আমরা খাবার সঙ্গে নিয়ে বেরতাম। তাতে অবশ্য বেশ মজা হত। ক্ষিদের সময় গাছতলায় বসে খাওয়ার আনন্দ আছে কি বল?

হেসে বললাম, কেদারনাথের পথে তা হলে তো ভদ্রলোকের ভালই লাগত।...

গৌরী চোখ. কপালে তুলে বলল, বল কি! ও না খেয়েই মরে যেত। এখানকার হোটেলে খেত ভেবেছ?

হোটেলে খাবে কেন? তুমি রান্না করে দিতে।

না বাবা, আমার দ্বারা হত না। এই খাটুনীর পর রান্না করা অসম্ভব।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়া শুরু হল। গায়ে দু'চার ফোঁটা পড়তেই আমি সচকিত হলাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি মেঘে ঢেকে ফেলেছে সব। চারদিকে গভীর অন্ধকার। দূরে চটির আলো আবছা। কুয়াশা নেমে এসেছে। তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। বৃষ্টি বাড়লে আর ঘরে ফেরা হবে না।

গৌরীর একটা হাত আমার হাতে নিয়ে বললাম, চলো।

ভীষণ অন্ধকার। দেখতে পাচ্ছিনা কিছু। গৌরীর হাত শক্ত করে ধরে এগিয়ে চললাম চটির দিকে।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ধারা বাড়ছে। কুয়াশা বাড়ছে। ঠাণ্ডা হাওয়ার

তীব্রতা বাড়ছে। চটির দরজা জানলা সব বন্ধ হয়ে গেছে। দু'চারজন মানুষ মাথায় ছাতা দিয়ে তখনো ঘুরছে আশ্রয়ের সন্ধানে। রামওয়াড়া চটিতে গভীর আঁধার। দূর থেকে সমবেত কণ্ঠের ভজন আর কীর্তন গান ভেসে আসছে।

গৌরী আমার হাত আঁকড়ে ধরে পথ চলতে চলতে বলল, জীবনটা যদি এমন হত, তাহলে কি ভালই না হত।

বললাম, গৌরী, এটাই জীবন। তুমি যেমনটা চাইবে জীবন তেমনটাই।

তা কি হয়?

গড়ে নিলে হয়। মেনে মিলে হয়। জীবনের অনেক কিছু আমরা সব সময় মানি না। মানলে জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। না মানলে অশান্তি।

গৌরী দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আমার হাত আরো জোরে আঁকড়ে ধরে হাঁটতে থাকল। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এসে জমাট কুয়াশার আবরণ ছিন্নভিন্ন করে দিতেই দেখলাম আমাদের চটি। নিচের দোকানে যাত্রীর ভীড়। বারান্দার অন্ধকারে গৌরীর মা কম্বল গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের অপেক্ষায়।

গৌরী একবার মাকে একবার আমাকে দেখে নিয়ে বলল, জীবন থেকে একটা সুন্দর দিনের অবসান হল।

আমি বললাম, বরং বল, জীবনের পাতায় একটা সুন্দর দিনের সংযোজন হল।

গৌরী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। আমিও হাসলাম। তারপর ধর্মশালার দিকে পা বাড়ালাম।

রামওয়াড়া চটির পুল পার হয়েই চড়াই।

জিগ্‌জ্যাগ একটানা চড়াই। মাঝে মাঝে পাকদণ্ডি। পাকদণ্ডি

পথের দূরত্বকে কমিয়ে দিয়েছে। অভ্যাস না থাকলে পাকদণ্ডি পথে চলা ঠিক নয়। এতে পরিশ্রম বেশি। তাছাড়া পড়ে যাওয়ার আশংকাও থাকে। সাধারণ যাত্রীরা পি-ডবলু-ডির তৈরি চওড়া পথে উঠছে।

কেদারনাথ তীর্থ সেরে যারা নামছে তাদের সম্ভ্রমের চোখে দেখছে সবাই। নমস্কার জানিয়ে বলছে, জয় কেদারনাথজী। অবিরাম যাত্রায় একদল উঠছে, একদল নামছে। যারা দর্শন সেরে আসছে তাদের চোখমুখে তৃপ্তির স্পর্শ। একদল আর একদলকে প্রশ্ন করে। জবাব দেয় অপর দল।

আর কত দূর? কত পথ বাকি আছে?

ওই তো সামনে। ওই পাহাড়টার পিছনেই সেই পরম তীর্থ।

পারব পৌঁছতে?

নিশ্চয়। ধীরে ধীরে যান—নিশ্চয় পারবেন।

জয় কেদারনাথজী—জয় কেদারনাথজী।

যাত্রা শুরু হয়। একদল চলে ওপরে—পরম তীর্থ-পথে, আর একদল নিচে সংসারের আকর্ষণে।

যুগ-যুগান্ত ধরে এ যাত্রা চলছে। শতাব্দী আগের যাত্রীর যে প্রশ্ন ছিল শতাব্দী পরের যাত্রীর সেই একই প্রশ্ন। আর কত দূর? আর কত পথ বাকি? পারব তো পরম তীর্থে পৌঁছতে?

চড়াই পথে এগিয়ে চলেছি। দেখছি যাত্রীদের।

মাতাজীর ডাণ্ডি কখনো আমাদের পাশে পাশে চলে, কখনো বা এগিয়ে যায়। ডাণ্ডিওলাদের এরকমই নির্দেশ দিয়েছি। মহিলার বয়েস হয়েছে। চটপট উচ্চতায় পৌঁছনো হয়ত ওঁর শরীরের পক্ষে সুবিধার হবে না। গতকাল রাত্রেই ওঁর মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। সকালের দিকে কম আছে। রামওয়াড়ার উচ্চতা আট হাজার ফুট। কেদারনাথ সাড়ে এগারো হাজারেরও বেশি। অতি উচ্চতাজনিত রোগ হতে পারে সহজেই। এ রোগে গা বমি এবং মাথায় অসহ্য

যন্ত্রণাই প্রধান। মাতাজীরও তাই হয়েছে। একটা ট্যাবলেট খাইয়ে ডাণ্ডিতে বসিয়ে দিয়ে নির্দেশ দিয়েছি ধীরে ধীরে যেতে।

পথে দুটি স্থানে যাত্রীদের জন্য চা-জলখাবারের দোকান। যাত্রীরা সেখানে বসছে। বিশ্রাম নিচ্ছে। আবার চলছে।

আজ গৌরী শান্ত গম্ভীর। সকাল থেকে মাত্র গুটিকয়েক কথা হয়েছে ওর সঙ্গে। পাশে পাশে চলেছে বটে তবে যেন ভাবনার কোন গভীরে হারিয়ে গেছে। ওর তন্ময়তা ভাঙ্গতে মন চায়নি আমার। তাই নিজেও কোনো কথা বলিনি। প্রশ্ন করিনি ওর এমন তন্ময়তার কারণ সম্বন্ধে।

ক্রমে চড়াই পথ শেষ হয়ে আসে। দূরে দেখা যায় সমতল উপত্যকা। মন্দাকিনী নদী সরে যায় আরও ডানদিকে দূরে। দু'পাশের পর্বতশৃঙ্গও সরে যায়। একটানা ক্লান্তিকর আরোহণ। আমরা এক উচ্চতা থেকে আর এক উচ্চতায় উঠে আসি।

পথের শেষ বাঁক নেবার পরই পুষ্পময় উপত্যকায় এসে পৌঁছই।

গৌরী পথের পাশে একটা জলধারার কাছে বসে পড়ে। ও হাঁপাচ্ছে। দ্রুত বুক ওঠানামা করছে। কপাল আর মুখ বেয়ে ঘাম ঝরছে।

আর কতটা পথ বাকি আছে? গৌরী জিজ্ঞেস করল।

দু'তিন ফার্লং হবে।

তারপরই কেদারনাথ?

হ্যাঁ। আর একটু এগোলেই মন্দির দেখতে পাবে।

সত্যি?

হ্যাঁ। এ জায়গার নাম তাই দেওদেখানী।

কি করে জানলে?

আগে এসেছিলাম, তাই।

কই, বসছ না যে?

বসলাম গৌরীর সামনে।

গৌরী বলল, একটু জল খেলে হত। খাওয়া যাবে এই জল ?

না খাওয়াই ভাল। আর একটু বাদেই তো কেদারনাথ চটি। সেখানে খেও।

এ জল তো বেশ পরিষ্কার। খেলে ক্ষতি কি ?

ক্ষতি আর কি। পেটের অসুখ হতে পারে।

মরব না তো!

হাসলাম। বললাম, গৌরী মরা এত সহজ নয়।

তবে খাই একটু।

গৌরী জলধারার সামনে বসে আঁজলা ভরে জল পান করল। হাতে জল নিয়ে মুখে ঘাড়ে বুলিয়ে দিয়ে বলল, চমৎকার ঠাণ্ডা। একটু খেয়ে দেখতে পার।

গৌরীকে খুশি করার জন্য চোখে মুখে ঠাণ্ডা জল বুলিয়ে দিয়ে বললাম, আজ সারা পথ এত কি ভাবছিলে বলো তো ? একটিও কথা বলো নি।

গৌরী আমার মুখে খানিক চেয়ে থেকে বলল, একটা কথা তোমায় বার বার বলব ভাবি, কিন্তু বলতে পারছি না। তোমরা বাঙালীরা বড্ড সেন্টিমেন্টাল।

সেন্টিমেন্টাল হলেও সহ্য করতে পারি। বলো, কি বলতে চাও।

গৌরী খানিক চুপ করে থেকে বলল, আজ থাক। তোমাকে সব কথা বলব পরে। তোমার কাছে আমি উপদেশ চাই। দেবে না ?

হেসে বললাম, বলেছি কি দেব না ? তোমার কথাটাই তো শোনা হয় নি। আগে শুনি তারপর নিশ্চয় আমার মতামত জানাব।

গৌরী এরপর চুপ করে গেছে। খানিক বিশ্রাম নিয়ে ও উঠেছে। এগিয়ে গেছে উপত্যকায় শ্যামল প্রান্তর ধরে। পথের ধারে রাশি

রাশি ফুল। গোছা গোছা ফুল তুলেছে। হাত ভরে গেলে তা আমার হাতে দিয়ে বলেছে, রাখ তো। আর চারটি ফুল তুলে নি। কেদার-নাথজীর পুজো দিতে লাগবে।

ফুলের রাশি নিয়ে আমরা পথের শেষে এসে থমকালাম।

গৌরী বলল, ফুল তো তুললাম, কিন্তু এ ফুল কি কেদারনাথজীকে দেওয়া যাবে?

কেন?

স্নান না করেই যে ফুল তুলেছি।

দুর্গম পথে অত হিসেব চলে না। কেদারনাথজী জানেন তাঁর ভক্ত, স্নান না করলেও ভক্তির অর্ঘ্যই এনেছে।

গৌরী সরলভাবে বলল, দেখ বাবা, শেষে যেন পাপ না হয়।

পাপ-পুণ্য মনের ব্যাপার। মন ঠিক থাকলেই হল।

গৌরী যেন আশ্বস্ত হল আমার কথায়।

মন্দাকিনী নদীর পুল পার হয়ে আমরা কেদার ভূমিতে প্রবেশ করলাম। গৌরী হাত জোড় করে ভক্তি ভরে প্রণাম জানাল দেবাদিদেবের উদ্দেশ্যে।

কেদারনাথ মন্দিরের সামনে রাস্তার দু' পাশে সারি সারি দোকানপাট। ওখানেই প্রাণের স্পন্দন অনুভব করা যায়। দোকান-গুলোর বেশির ভাগই চা আর খাবারের। বাকি দোকান ফটো আর পূজাপকরণের। তীর্থযাত্রীদের ভিড়ও ওখানেই।

মাতাজীকে ধর্মশালায় রেখে আমি আর গৌরী বেরিয়েছি। সকালে পূজা দেওয়ার পর সেই যে মাতাজী বিছানা নিয়েছেন আর উঠতে চাননি। শীতে মহিলাকে বেশ কাবু করেছে।

দোকানে ঘুরে ঘুরে ছবি আর মালা দেখছে গৌরী। একটা করে মালা বাছাই করছে আর আমার হাতে তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করছে, পছন্দ কি না। হ্যাঁ বললে আর একটা মালা তুলে বলছে, এটা না

ওটা, কোনটা ভাল। আসলে পছন্দ ওর কোনটাই নয়। এ এক খেলা যেন। আর আমি ওর এই খেলার দোসর।

কয়েকটা পুঁতির মালা আর কেদারনাথদেবের ফটো কিনল গৌরী শেষ পর্যন্ত।

দোকান ঘোরার পালা শেষ করে আমরা কেদারনাথ মন্দিরের পিছনে জগদ্‌গুরু শ্রীশংকরাচার্যের স্মৃতি মন্দিরের বিস্তৃত আঙিনায় সিমেণ্টের তৈরি বেঞ্চে বসলাম। খোলা আকাশের নিচে স্থানটি খুবই নিরিবিলি। এদিকটায় লোকজন আসে না তেমন। কেদারনাথের বিশাল মন্দিরের আড়ালে যাঁত্রীদের নজর কাড়তে পারে না।

গৌরী সকালেই জগদ্‌গুরুর স্মৃতি মন্দিরের স্থানটি নিয়ে সমালোচনা করেছে। বলেছে, যার জন্য আজ কেদারনাথ সবার কাছে পরিচিত অবারিত তাঁর স্মৃতি মন্দির এই আড়ালে কেন? জায়গা নির্বাচন কিন্তু ভাল হয় নি।

আমি বলেছিলাম, জায়গা পায়নি বলেই এখানে মন্দির তৈরি করছে। আগে এই উপত্যকায় এত ঘর-বাড়ি ছিল না। তখন পরিকল্পনা করলে হয়ত ভাল জায়গা পাওয়া যেত। অবশ্য সবার নজরে না পড়লেও জায়গাটি কিন্তু চমৎকার।

গৌরী বলেছিল, তা ঠিক। বিশেষ করে কেদারনাথ মন্দির আর তুষার শৃঙ্গের কোলে এমন জায়গাই জগদ্‌গুরুর স্মৃতির আদর্শ। তাহলেও সবার চোখে পড়বে না বলে আমার খারাপ লাগছে।

সিমেণ্টের বেঞ্চে বসে গৌরী আশপাশে নজর বুলিয়ে বলল, প্রেম করার আদর্শ জায়গা, কি বল?

আমি বিস্ময়ের ভান করে বললাম, বাবা, এই সাড়ে এগারো হাজার ফুট ওপরে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় কে প্রেম করতে আসবে এখানে?

কেন, আসতে পারে না?

তোমার মতো পাগল হলে আসতে পারে।

গৌরী মুচকি হেসে বলল, তাহলে তুমিও পাগল ?

গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করলাম, এটা কি তোমার মনের কথা গৌরী ?

যদি হ্যাঁ বলি ?

গৌরীর একটা হাত নিজের দু'হাতের মুঠোয় নিয়ে বললাম, তাহলে পাগল হতে রাজি আছি।

গৌরী আমার মুখে অপলক তাকিয়ে থাকল।

কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না, আমরা কোনো কথা বলিনি। কথা বলতে পারিনি। যে সুরে যে ছন্দে আমাদের হৃদয়ের তার বাঁধা হয়েছে তা কথা বললে যদি ছিঁড়ে যায়—তাই কেউ কথা বলিনি। শুধু দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে হাতে হাত রেখে হৃদয়ের উত্তাপ অনুভব করেছি। আমরা দু'জনে মিশে গেছি একে অপরের সঙ্গে। নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছি। ভুলে গেছি নিজেদের আলাদা অস্তিত্ব। আমরা সেই আদম আর ইভ। সৃষ্টির সূচনায় যারা একে অপরের দিকে প্রথম তাকিয়ে সৃষ্টির রহস্য অনুভব করেছিল। একে অপরকে ভালবেসে পৃথিবীর প্রথম প্রেম সৃষ্টি করেছিল। আমরা সেই চিরন্তন প্রেমের সাগরে ডুবে রইলাম।

তীব্র দমকা হাওয়ায় চমক ভাঙল। প্রচণ্ড হিমেল হাওয়া বইছে। সঙ্গে তুলোর মতো হালকা তুষার কণা উড়ছে। সূর্য অস্ত যায়নি তখনো। তবে আলোর তেজ কমে এসেছে। হাত ঘড়িতে দেখলাম সন্ধ্যা ছ'টা। রাত হতে এখনো দেরি আছে। এখানে সন্ধ্যা হয় প্রায় আটটায়। নির্জন শংকরাচার্যের স্মৃতি মন্দিরের অঙ্গন। মানুষজন কেউ নেই। মন্দিরও প্রায় জনশূন্য। এবার ঘরে ফেরা দরকার।

গৌরী, তুষার পড়ছে। চলো যাই···

না, বসো।

ঠাণ্ডা লাগবে যে।

একদিন ঠাণ্ডা লাগলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না।

ঘরের বারান্দায় বসে তুষার পড়া দেখা যাবে। ওঠো।

আর একটু বসো। এমন স্মৃতি আর হয়ত আমাদের জীবনে আসবে না।

গৌরীর হাত নিজের হাতে চেপে ধরে বললাম, এ কথা বলছ কেন গৌরী? আজকের স্মৃতি চিরদিন থাকবে আমাদের জীবনে। এতো ভোলার নয়।

আমি সে কথা বলিনি। বলেছি এমন সুন্দর একটা দিন আমাদের জীবনে দ্বিতীয়বার না আসতেও পারে। তাই আর একটু বসো। স্মৃতির পাতায় যতটা লিপিবদ্ধ করে নেওয়া যায় ততোটাই লাভ আমার।

গৌরী চুপ করে বসে রইল। ঝির ঝির করে বরফ পড়ছে। ঘন মেঘ আমাদের গায়ে আছড়ে পড়ছে। খেলা করছে। মেঘের সোঁদা সোঁদা গন্ধ নিঃশ্বাস ভারী করে দিচ্ছে। বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ তুষার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়। ফলে বুক ভারী হয়ে ওঠে। ঘন ঘন শ্বাস বয়।

শংকরাচার্যের স্মৃতি মন্দিরের খোলা অঙ্গন তুষারে সাদা হয়ে যাচ্ছে। আশপাশের পাহাড়-পর্বত আগেই সাদা হয়ে গেছে। গৌরীর লাল শালও সাদা তুষারে সাদা। ওর মাথার রাশিকৃত চুলে তুষার জমেছে। পড়ন্ত আলোয় অলৌকিক দেখাচ্ছে গৌরীকে। বুকের মধ্যে একটা আবেগ আমায় অস্থির করে তুলল। ইচ্ছে হল ওকে বুকের গভীরে পেতে। কিন্তু একটা শিষ্টতাবোধ আমার ভেতরের আকাঙ্খাকে দমিয়ে রেখেছে। গৌরীর তুষার মাখা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার ভেতরের দুর্দমনীয় সেই আকাঙ্খাটা তীব্র হয়ে উঠল। ভুলে গেলাম শিষ্টতাবোধ। আকাঙ্খার দাস হয়ে গৌরীকে দু' হাতে বুকের মধ্যে টেনে নিলাম। আমার উষ্ণ নিঃশ্বাস ওর মুখ বুক বুঝি উত্তপ্ত করে দিল। গৌরী নিজেকে আমার বুকে সমর্পণ করে দিল।

জাগতিক আশা-আকাঙ্খার ঊর্দ্ধে অলৌকিক আনন্দানুভূতির গভীরে আমরা হারিয়ে গেলাম ক্রমে।

কেদারনাথ থেকে ফিরে চলেছি।

উৎরাই পথ। চলার গতি বেড়েছে। গৌরী প্রায় দৌড়ে দৌড়ে নামছে। অদম্য উৎসাহ ওর। গৌরীর মা আজ কেদারনাথ থেকে দেওদেখনি পর্যন্ত পায়ে হেঁটে এসেছেন। তারপর ডাণ্ডিতে বসেছেন। ডাণ্ডিওলাদের গৌরীকুণ্ডে বিশ্রাম করতে বলেছি। গৌরী কিন্তু আজ ডাণ্ডিওলাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পথ চলছে। রামওয়াড়া পর্যন্ত প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এলাম সবাই।

সকাল থেকেই গৌরী আমায় কেমন যেন এড়িয়ে চলছে। চোখে চোখ পড়লেই লাজুক হাসে। চোখ সরিয়ে নেয়। এ কারণে সকাল থেকে একটাও কথা হয়নি। রামওয়াড়ায় একটা চায়ের দোকানে বসার পর ও প্রথম কথা বলল।

আজই কি আমরা বদরীনারায়ণজী যেতে পারব?

বললাম, আজ বাস পাওয়া যাবে না বোধ হয়। যদিও বিকেলের বাস পাওয়া যায় তাহলে বড় জোর রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত যাওয়া যাবে। তাতে লাভ নেই। পথে রাত কাটানোর চেয়ে এখানে থাকাই ভাল।

গৌরী বলল, আমার মনে হয় এগিয়ে যাওয়াই ভাল।

রুদ্রপ্রয়াগে রাত কাটাতে পারবে?

কেন? অসুবিধে কিছু আছে নাকি?

আসার সময় খোলা আকাশের নিচে রাত কাটানোর কথা ভুলে গেছ?

কেন, তোমার ভাল লাগেনি? আমি তো ওই রাতটার কথা ভুলব না কখনো। সারারাত বসে গল্প করতে করতে কখন যেন রাত ভোর হয়ে গেছল তা বুঝতেই পারিনি। কত বার আউটিং করেছি

রথীনের সঙ্গে কিন্তু কখনো রাত জাগিনি। অবশ্য এমন পরিবেশও পাইনি আগে। তুমি পেয়েছ?

পাহাড়ে ঘুরলে এমন অভিজ্ঞতা হয় সবার।

গৌরী আমার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, এবারের অভিজ্ঞতা তোমার কি রকম লাগছে? আমার মতো আর কোনো মেয়ের সঙ্গে হিমালয়ে ঘুরেছ?

মেয়ে সঙ্গী পেয়েছি, তবে তোমার মতো নয়।

তাদের কারো সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে?

হ্যাঁ। আমি যাদের সঙ্গে মিশি ঘনিষ্ঠ হয়েই মিশি।

তারা তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে পরে?

না।

তারা না তুমিই রাখনি?

তোমার কি মনে হয় গৌরী?

আমার তো মনে হয় তুমিই সম্পর্ক রাখনি।

কিসে তোমার মনে হল বলবে?

গৌরী হেসে বলল, বললে তো রেগে যাবে।

আমার রাগটা কম। তাছাড়া কারো অনুমানের ওপর রাগ করার মানে হয় না। তুমি সচ্ছন্দে বলতে পার।

গৌরী কিছুটা গম্ভীরভাবে বলল, সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে পুরুষরা বড় বেশি নির্লিপ্ত। সম্পর্ক পাতাবার সময় গভীরতার অভাব হয় না। কিন্তু সেই গভীর সম্পর্কের ভিত গভীর নয়। আউট অব সাইট আউট অব মাইণ্ড।

এটা তোমার অনুমান।

কিছুটা তা[illegible]বে সবটা অনুমান নয়। পরীক্ষিত সত্য।

প্রমাণ আছে নাকি?

না থাকলে বলছি?

ঠিক আছে প্রমাণ কর।

গৌরী হঠাৎ উঠে পড়ল। লাঠিটা হাতে নিয়ে বলল, ঝগড়া করতে চাও নাকি? ঝগড়ার মধ্যে আমি নেই। চলো এগোই।

প্রসঙ্গ এড়িয়ে গৌরী হাঁটা শুরু করল। আমিও চললাম ওর পিছনে। উৎরাই পথ। রামওয়াড়া চটি ক্রমে পার হয়ে বরফের সেতু অতিক্রম করে অরণ্য পথে নামতে থাকলাম। গৌরী চলেছে আমার সামনে।

চীরবাসা পার হয়ে গৌরীকুণ্ডে পৌঁছে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার চলা। পথে কোনো কথা নেই কারো মুখে।

একটানা উৎরাই শেষ হল সোনপ্রয়াগে।

আমরা সোনপ্রয়াগে যখন পৌঁছলাম তখন বিকেল। বিকেলের বাসটা ভর্তি হয়ে গেছে আগেই। এ বাস সোজা বদরীনারায়ণ যাবে। পথে একটা রাত কোনো চটিতে কাটিয়ে পরদিন সকালে পৌঁছবে বদরীনারায়ণ।

শেষ বাসটা যখন চলে গেল গৌরী হতাশ হয়ে আমার মুখে তাকিয়ে বলল, গাড়িটায় জায়গা পেলে ভাল হত।

সোনপ্রয়াগও কিন্তু ভাল। বললাম আমি।

গৌরী কটাক্ষ করে বলল, এখানে নদীর ধারে বসে সারা রাত জেগে গল্প করা যাবে কি?

তুমি চাইলে নদীর ধারে আমরা আজকের রাতটা কাটাতে পারি দু'জনে। বলো তো মায়ের অনুমতি নিয়ে আসি।

গৌরী চোখ পাকিয়ে বলল, থাক, আর সাহস দেখাতে হবে না। মাকে তীর্থ করিয়ে ভেবেছ যা খুশি করবে। কথা কটা বলে নিজেই হেসে ফেলল। তারপর বলল, তাড়াতাড়ি ঘরের ব্যবস্থা করো। যা লোক এসেছে দেখছি ঘর পাওয়া মুশকিল হবে। আর ঘর না পেলে সত্যি সত্যিই পথে রাত কাটাতে হবে।

সোনপ্রয়াগে ঘরের খোঁজে বেড়িয়ে পড়লাম গৌরীর ধমক খেয়ে।

বাস ছুটে চলেছে বদরীনারায়ণের পথে।

দু'পাশের পাহাড় নদী অরণ্য মানুষ সরে যাচ্ছে ছায়াছবির মতো। এখন একটানা চড়াই। একঘেয়ে টপ-গিয়ারের বিশ্রী শব্দ। কানে তালা লেগে আছে। ঘুমন্ত যাত্রীরা সবাই জেগে উঠেছে। আর খানিকবাদে বাস পৌঁছবে বদরীনারায়ণ উপত্যকায়। সব তীর্থের সার বদরীনারায়ণ। এ তীর্থে এলে মুক্তি। মুক্তি বার বার মানুষের পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার। এ তীর্থের প্রসাদে বৈকুণ্ঠ লাভ। তাই তীর্থকামী মানুষ ছুটে আসছে যুগ যুগ ধরে বদরীনারায়ণের পথে। ঘুমন্ত মানুষগুলি এ কারণে উৎকর্ণ।

গতকাল রাতে সোনপ্রয়াগে গরমে ঘুম হয়নি। ভোরের বাসের টিকিট কাটার জন্য তাই প্রায় সারারাত গৌরী আর আমি লাইন পাহারা দিয়েছি। সকালের বাসের টিকিট পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি।

সোনপ্রয়াগ থেকে বাস ছেড়েছে সকাল পাঁচটায়। এটাই সরাসরি বদরীনারায়ণের প্রথম বাস। প্রথম শ্রেণীর তিনটি আসনে আমরা তিনজন। জানলার ধারে গৌরী মাঝে মাতাজী এবং তাঁর পাশে আমার আসন। সোনপ্রয়াগ থেকে রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত কেউ প্রশ্ন করে নি। পথ ওদের চেনা। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে অলকানন্দা নদীর ধার দিয়ে বাস চলা শুরু হতেই মা মেয়ে প্রশ্ন করে—এটা কোন নদী, ওটা কোন পাহাড়। গ্রামের নামও জিজ্ঞেস করতে ছাড়ে না। ওদের ধারণা আমি যেহেতু এপথে আগে এসেছি সুতরাং সব নদী সব পাহাড় সব গ্রাম আমার দেখা জানা চেনা।

কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ আর চামোলিতে বাস থামেনি। চলতি পথে জায়গাগুলির মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে হয়েছে। পিপুলকোটিতে বাস থেমেছিল এক ঘণ্টার জন্য। খাওয়া এবং ঘোরার অবসর মিলেছিল। ওখানে বাজারটি বেশ বড়। আগে পাকাবাড়ি তেমন ছিল না, এখন বহু পাকাবাড়ি আর দালান তৈরি হয়েছে। দোকানে আধুনিক কালের

প্রয়োজনীয় সবকিছুই পাওয়া যায়। বিজলীবাতি পিপুলকোটির বাড়তি আকর্ষণ। ডাকঘর ডাকবাংলো ধর্মশালা সবই আছে। খাওয়ার হোটেলই বেশি। মাছ মাংস সবই পাওয়া যায়।

পিপুলকোটি থেকে চড়াই পথ শুরু হয়েছে। ষোল মাইল পথ বড় ভয়াবহ। পাহাড়ে নানা জায়গায় ধ্বস নেমেছে। ধ্বসা জায়গায় অদ্ভুত দক্ষতায় যাত্রী বোঝাই বাস পার করিয়ে শেষে জগদ্‌গুরু শংকরাচার্যের উত্তর ধাম যোশীমঠে যখন বাস এসে পৌঁছয় তখন বেলা দুপুর।

ছয় হাজার ফুট উঁচু যোশীমঠ জায়গাটি বড় সুন্দর। বর্তমানে সমৃদ্ধ শৈলশহর। স্কুল-কলেজ, কোর্ট-কাছারি, হাসপাতাল, বাজার দোকান, ধর্মশালা ডাকবাংলো ইত্যাদি সবই আছে। এখানে শংকরাচার্যের গদী এবং নৃসিংহনারায়ণের মন্দির বিখ্যাত।

মাতাজী যোশীমঠের কথা আগেই শুনেছিলেন। একটা দিন এখানে থাকার জন্যেও বলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত বাসের অবস্থার কথা ভেবে তাঁকে সংকল্প ত্যাগ করতে হয়। বাস থেকে নামলে আর পরে বাসের টিকিট পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠবে।

যোশীমঠ থেকে গেট সিসটেম চালু হয়েছে। বদরীনারায়ণের পথে মোটর বাস 'ওয়ান ওয়ে' চলে। পথ খারাপ তাই এই ব্যবস্থা। সময় মতো আমাদের বাস এখানে পৌঁছনোয় সহজে গেট পেয়ে গেলাম। না হলে ঘণ্টা দুয়েক পরে পরবর্তী গেটের অপেক্ষা করতে হত।

যোশীমঠ থেকে উৎরাই পথে আমরা নেমে এসেছি ধৌলী ও অলকানন্দা নদীর সঙ্গমে। তারপর এগিয়ে চলেছি অলকানন্দার উজানে। প্রথমে গোবিন্দঘাট চটিতে বাস থামে। গোবিন্দঘাটের কাছে অলকানন্দার ওপর ঝোলা সেতু দেখে মাতাজী জিজ্ঞেস করেন, ও কোন ব্রিজ? ওপারের পথ কোথায় গেছে?

বলি, ওপারের পথ গেছে নন্দনকানন আর লোকপাল-হেমকুণ্ড। নন্দনকাননে আছে দু-শ'র ওপর বিভিন্ন জাতের ফুল। যুগপদ্ম আর ব্রহ্মকমল পাওয়া যায় ওখানে।

গৌরী বলে, লোকপাল-হেমকুণ্ড তো শিখ তীর্থ, তাই না ?

মাতাজী জিজ্ঞেস করেন, তুই জানলি কোথা থেকে ?

তোমার ওই ছেলের কাছ থেকে।

মাতাজী আমাকে প্রশ্ন করেন, তুমি গেছ ওখানে ? বাস যায় না ?

না। এখনো মোটরের পথ হয়নি।

আমরা যেতে পারব না ?

খুব কষ্ট হবে মাতাজী। ডাণ্ডি-কাণ্ডি যোগাড় করা মুশকিল।

বৃদ্ধা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নন্দনকাননের পথে তাকিয়েছিলেন যতক্ষণ না বাসটা গোবিন্দঘাট ছাড়িয়ে গেছিল।

গোবিন্দঘাটের পর বাস থামে পাণ্ডুকেশ্বর। ওখানে আছে যোগবদরীর মন্দির। বাসরাস্তা থেকে অনেক নিচে। এ কারণে আর মন্দির দেখা হয়নি। বাস থেকেই মাতাজী যোগবদরীর উদ্দেশ্যে প্রণাম সেরে নিয়েছেন।

পাণ্ডুকেশ্বরের পর অরণ্য পথ। বৃদ্ধ বনস্পতির গভীর অরণ্যলোক। অনেক জায়গায় সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না। সব শেষে বাস থেমেছিল হনুমান চটিতে। এখান থেকে বদরীনারায়ণের বাকি সাত-আট মাইল পথ যেমন চড়াই তেমন বিপৎসঙ্কুল। মোট চোদ্দটা কঠিন বাঁক আছে চড়াই পথে। প্রথম সাতটি দীর্ঘ। কিন্তু শেষ সাতটি বাঁক যেন মেয়েদের চুলের কাঁটার মতো। এ জন্যই বাঁকগুলির নাম হেয়ার পিন বেণ্ড। একটু অসাবধান হলে নির্ঘাৎ পতন এবং মৃত্যু। প্রতিটি বাঁকে পথ উঠেছে ওপরে।

শেষ বাঁকটা পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাস যাত্রীদের আকাশ কাটানো ধ্বনি 'জয় বদরীবিশাল'।...

বাসের উইণ্ড স্ক্রিনের মধ্য দিয়ে বদরীনারায়ণ মন্দিরের স্বর্ণময় শীর্ষ দেখা যাচ্ছে। পিছনে মহামহীম নীলকণ্ঠ। নীলচে বরফে ঢাকা পর্বত শিখর নীলকণ্ঠ। মন্দিরের সামনে বিশাল উপত্যকা—বদরীনারায়ণ। উপত্যকা পথের ডান দিকে বোর্ডে লেখা রয়েছে 'দেওদেখনি'।

গৌরী বিস্ময় মেশানো খুশি গলায় বলল, আমরা বদরীনারায়ণ পৌঁছে গেলাম।

হ্যাঁ। ওই তো মন্দিরের সোনালী চুড়ো দেখা যাচ্ছে।

ইস্, এত সহজে এত তাড়াতাড়ি দুর্গম তীর্থে পৌঁছতে পারলাম!

আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে এটাই আমাদের মস্ত লাভ। আগে কত যাত্রীই না এই দুর্গম তীর্থ দর্শন না করেই ফিরে যেত। পথের দুর্গমতা তাদের ফিরিয়ে দিত। এখন সমর্থ অসমর্থ সব মানুষকেই মোটর-বাস নিয়ে আসছে এই পথে। বিজ্ঞান দুর্গমকে সহজ করে দিয়েছে।

অলকানন্দা নদীর এপারে বাস স্ট্যাণ্ড। ওপারে বদরীবিশালজীর মন্দির।

বাস থেকে নামলাম। মালপত্র নামাচ্ছি এমন সময় গৌরী মায়ের মুখে তাকিয়ে বলল, মা, তোমার এতদিনের কেদার-বদরী দেখার ইচ্ছে মিটল তো?

মাতাজী হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ছেলের জন্যেই হল। তুমি না থাকলে পরম তীর্থ দর্শন আমার হত কিনা জানি না বেটা।

গৌরী ধমকে উঠে, আবার ছেলে! সব ক্রেডিট ওর, আমার কিছু নয়?

মাতাজী মেয়েকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আদর করে বললেন, তোরই তো সব পাওনা। তোর জন্যেই ছেলে আমাদের সঙ্গে এলো। আর তাই না তীর্থ হল। এ গর্ব আমার চেয়ে তোরই বেশি।

মায়ের কথায় গৌরীর মুখ লাল হয়ে গেল।

আমি মজা পেলাম।

মাতাজীর ইচ্ছায় আর আগ্রহে বদরীনারায়ণে আমাদের তিন রাত্রি বাস করতে হল। তে-রাত্রির আজ শেষ রাত। আজকের রাত

পোহালেই কাল ভোরের প্রথম বাসে ঋষিকেশ যাত্রা করতে হবে। ঠিক মতো বাস চললে রাত নটা নাগাদ ঋষিকেশ পৌঁছব।

এ তিন দিনে মাতাজী আর গৌরী অনেক কথা বলেছে। একটা পরিবারের ইতিহাস শোনা বড় সহজ নয়। আপনজন ছাড়া নিভৃতের কথা কেউ কাউকে বলে না। আমি ওদের আপনজন না হলেও হিমালয়ের দুর্গম পথের সঙ্গী হয়ে ওদের অনেক কাছের একজন হয়েছি। তাই হয়ত সব কথা বলেছে আমাকে। অথবা অতি উচ্চতার কারণে মনের গোপনতা রাখতে পারে নি।

…গৌরীর বাবা পূর্ব বাঙলার রাজধানী ঢাকা শহরে জন্মেছিলেন। পড়াশোনাও সেখানে করেছেন। বছরে দু'বছরে একবার রাজস্থানে দেশের বাড়িতে আসতেন তাঁর ব্যবসায়ী বাবার সঙ্গে। বাবার বড় ব্যবসা ছিল ঢাকায়। গৌরীর বাবা স্কুল-কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া ঢাকায় শেষ করে রেলের চাকরি পান। পদটা বেশ উঁচু। পোষ্টিংও হয় ঢাকায়। ঢাকায় জীবন কাটলেও বিয়ে করতে আসেন রাজস্থানে। ওই একটা ব্যাপারে ওঁর পরিবার খুবই গোঁড়া। বিয়ের পর পূর্ব বাঙলায় সংসার করতে আসেন গৌরীর মা। সংসার যখন বেশ জমে গেছে তখন গৌরীর বাবা ঠিক করলেন ঢাকায় জমি কিনে বাড়ি বানাবেন। জমিটা কেনাও হয়ে গেছিল এমন সময় দিল্লীতে রেল বোর্ডের অফিসে ডাক এলো। আরো উঁচু পদ। অনিচ্ছা সত্বেও আসতে হল সংসার সঙ্গে নিয়ে।

তখন সংসার বলতে একটা ছেলে আর গৌরীর মা-বাবা। গৌরীর জন্ম হয় দিল্লীতে স্বাধীনতার ক'বছর পর।

দিল্লীতে বসতে না বসতে দেশ বিভাগের ডামাডোল। ঢাকা থেকে পাত্তাড়ি গুটিয়ে পরিবারের সবাই চলে এলেও গৌরীর ঠাকুর্দা রয়ে গেলেন ব্যবসা নিয়ে। গৌরীর বাবার হল সমস্যা। দিল্লী থেকে ঢাকা এমন কিছু দূর না হলেও সরকারের উঁচু পদে থেকে বিদেশে

প্রবেশের সমস্যা দেখা দিল। অনেক চেষ্টা করে তিনি বাবার সঙ্গে তিন চার বার মাত্র দেখা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু গৌরীর মা একবারই মাত্র ঢাকায় আসতে পারেন। গৌরীর জন্মের পর বৃদ্ধ নাতনীকে দেখতে চেয়েছিলেন। গৌরীর বাবা চেষ্টা করেও মেয়েকে নিয়ে আর ঢাকা যেতে পারেন নি।

গৌরীর পাঁচ বছর বয়েসে ওর বড় ভাই মারা যায়। সে বছরই ঢাকা থেকে ঠাকুর্দার মৃত্যু সংবাদ আসে। ঠাকুর্দার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার সম্পত্তিও যেন ডানা মেলে উধাও হয়ে যায়।

দাদা মারা যাবার পর গৌরী মা-বাবার নয়নের মণি হয়ে ওঠে।

ছেলের মতো করে মেয়েকে মানুষ করেন ওর বাবা। অফিসের প্রতিটি পার্টিতে গৌরীকে নিয়ে যান। মেয়ের তাগিদে ভ্রমণ করেন। শেষে মেয়েকে কো-এডুকেশন স্কুলে ভর্তি করে দেন।

স্কুলে পড়ার সময়ই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় রথীনদের পরিবারের সঙ্গে। রথীনের বাবা কলকাতার রেল দফতর থেকে দিল্লীর বোর্ডের অফিসে বদলী হয়ে আসেন। পাশাপাশি কোয়ার্টার্স ওঁদের। দুটি পরিবারের পরিচয় ঢাকা থেকেই। ওঁরা ঢাকায় একই পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। চাকরিও একই রেল দফতরে।

রথীনের পাশাপাশি বড় হয়েছে গৌরী। কলেজে ভর্তি হবার সময় গৌরীর আগ্রহে রথীনের বাবা রথীনকে কো-এডুকেশন কলেজে ভর্তি করে দেন। দু'জনে পড়াশোনা করত একই ক্লাশে। কলেজে পড়ার সময়ই গৌরীর বাবা হঠাৎ মারা যান। তখন রথীনের বাবা গৌরীদের পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব নেন। গৌরীর আগ্রহে আর রথীনের বাবার ভরসায় গৌরীর মা দিল্লীতে থাকা মনস্থ করেন।

রথীন আর গৌরীর মিল দেখে দুটি পরিবারই বহুদিন মনে মনে আশা পোষণ করতেন। গৌরীর বাবা মারা যাওয়ার পর রথীনের বাবা গৌরীর মাকে প্রস্তাব দেন ওদের বিয়ের। গৌরীর মা খুশি হয়ে

রাজী হয়ে যান। মা-বাবার কথা রথীন গৌরীরও অজানা থাকে না। ঠিক হয় বি-এ পাশ করার পর বিয়েটা হবে।

গৌরী আর রথীন বি-এ পাশ করার পর রথীনের বাবা চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বছর খানেক দিল্লী থাকার পর তাঁকে পৈতৃক সম্পত্তি আগলাবার জন্য কলকাতায় যেতে হল। রথীন থাকল দিল্লীতে। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে চাকরির চেষ্টা করতে লাগল। চাকরিটা হয়ে গেলেই বিয়ে।

একদিকে দু'জনে যখন রঙিন স্বপ্নে বিভোর তখন আর একজন যিনি এই বিশ্বসংসারের নিয়ন্তা তিনি অলক্ষে বসে হাসছেন।

গৌরীদের বাড়িওয়ালার ছেলে রাকেশ ভাল সাঁতারু। গৌরীর সাঁতারের হাতেখড়ি তার কাছে। রথীনও রাকেশের বন্ধু। কোনো মালিন্য ছিল না কারো মধ্যে। থাকলেও জানত না গৌরী। সেই রাকেশকে কেন্দ্র করে গৌরী আর রথীনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সূচনা হল।

রথীন জানত গৌরী সাঁতার শেখে রাকেশের কাছে। ওরা একই কলেজের সহপাঠী বন্ধু। ছুটির দিন তিনজনে আউটিংও করেছে। রাকেশ জানে গৌরী আর রথীনের সম্পর্ক। এ নিয়ে ঠাট্টা-ঠিসারাও করে। দোষের কিছু নয়। অবশ্য রথীন খুবই অস্বস্তি বোধ করে রাকেশের ঠাট্টায়।

একদিন গৌরী জোর করে রথীনকে সুইমিং পুলে নিয়ে এলো। কতটা সাঁতার শিখেছে তা দেখানই ওর উদ্দেশ্য ছিল। আর এটাই হল কাল।

গৌরী ড্রেসিং রুম থেকে সুইমিং কষ্ট্যুম পরে যখন বেরিয়ে এলো তখন রথীনের চক্ষু স্থির। জ্বলন্ত রূপ গৌরীর। রথীন তাকাতে পারছে না ওর দিকে। লজ্জায় রাঙা হয়ে যাচ্ছে। আড় চোখে আশপাশে তাকিয়ে দেখে সবাই যেন গিলছে গৌরীকে। গেলারই কথা। এ-রূপে গৌরীকে কেন, কোনো মেয়েকেই কখনো দেখেনি রথীন। দেখেছে

ছবিতে, ক্যালেণ্ডারে। গৌরী যেন ক্যালেণ্ডারের পাতা থেকে জীবন্ত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে সামনে।

গৌরী জলে নামার পর রথীন স্বস্তিবোধ করল।

সাঁতার কাটছে গৌরী নানা ভঙ্গিতে। রথীনের মনে হল একটা রাজহংসী যেন মানস সরোবরে বিচরণ করছে। চমৎকার লাগছে দেখতে। মাঝে মাঝে গৌরী রথীনের দিকে তাকিয়ে হাসছে। রথীনও হাত নেড়ে ওর খুশিভাব জানিয়ে দিচ্ছে। গৌরীর পাশে পাশে সব সময় রাকেশ রয়েছে। ওকে সাহায্য করছে। রাকেশের সাহায্য করাটা যদিও ওর ভাল লাগছিল না।

সব শেষে ডাইভিং।

গৌরী ডাইভিং বোর্ডে উঠে জলে ডাইভ দিচ্ছে। প্রতিটি ডাইভে গৌরী জলের মধ্যে বৃত্ত রচনা করে তলিয়ে যাচ্ছে। ভয়ে বুক দুরু দুরু করছে রথীনের। গৌরী যদি আর জল থেকে উঠতে না পারে? কিন্তু প্রতিবারই গৌরী জল ঠেলে উঠে আসছে। রথীনের অবরুদ্ধ শ্বাস মুক্ত হচ্ছে বুকের পাঁজর থেকে।

হঠাৎ শ্বাসটা সত্যি রুদ্ধ হল রথীনের বুকের মধ্যে। গৌরী ডাইভ দিয়ে অনেকক্ষণ বাদে জলের ওপর ভেসে উঠে হাত তুলে সাহায্য চাইল। ও সাঁতার কাটতে পারছে না। জলের ওপর ভেসে থাকার চেষ্টা করছে।

রাকেশ ডাইভিং বোর্ডের কাছে ছিল। গৌরীর অবস্থা বুঝতে পেরে মাছের মতো জল কেটে গৌরীর কাছে চলে গেল। তারপর গৌরীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে ভাসতে চেষ্টা করল। দু'জনেই জলে ডুবছে। রথীন ভাবছে, যে ভাবে রাকেশ ওকে বুকের ওপর নিয়েছে তাতে দু'জনেরই ডোবার কথা। ওভাবে কি জল থেকে উদ্ধার করা যায়! গায়ে ঘাম দিচ্ছে রথীনের।

চারদিকে যখন গুঞ্জন উঠছে দর্শকদের মধ্যে তখন রাকেশ গৌরীকে বুকের ওপর নিয়ে সাঁতার কেটে পুলের ধারে এলো।

মাটিতে পা দিয়ে দু'জনেই হেসে উঠল। ভয়ার্ত দর্শকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

গৌরী হাসতে হাসতে রথীনের কাছে এসে বসে পড়ল। বলল, তুমি খুব ভয় পেয়েছিলে না?

ভয় পাব না? তুমি জলে ডুবে যাচ্ছিলে।

গৌরী খিল খিল করে হেসে উঠল।

আমার ভয় হয়েছে দেখে হাসছ?

আসলে আমি ডুবিনি। ওটা রেসকিউ অপারেশন।

মানে?

সত্যি যদি ডুবে যেতাম তাহলে রাকেশ আমায় উদ্ধার করত।

রথীন অবাক হল। হঠাৎ রেসকিউ অপারেশন দেখাবার কি কারণ? এ তো কোনো প্রদর্শনী নয়। রাকেশের বুকে গৌরীর ভেসে আসার দৃশ্যটা সেই মুহূর্তে খুব বিশ্রী লাগল রথীনের। রাকেশের প্রতি একটা রাগ চাপা রইল ওর ভেতরে। এ রাগের উৎস কি হিংসা?

ক'দিন বাদে সন্ধ্যার সময় ওরা বেড়াতে বেড়াতে এলো যমুনার ধারে। মাঝে মাঝে রথীন আর গৌরী আসে এদিকে। যমুনার কালচে জলের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে ওদের ভাল লাগে।

রথীন অস্বাভাবিক গম্ভীর। ক'দিন ধরেই ওর এই গাম্ভীর্য লক্ষ্য করছে গৌরী। জিজ্ঞেস করবে ভেবেও করেনি। রথীনরা সবাই কলকাতায় চলে যাচ্ছে দু'এক মাসের মধ্যে। ওর বাবা ইতিমধ্যেই কলকাতায় চলে গেছেন। কথা হয়ে আছে রথীন রেজিষ্ট্রী ম্যারেজ করে তবে কলকাতায় যাবে। একটা চাকরি হব হব করছে সেখানে। কলকাতায় পাকাপাকি বসার পর শুভদিন দেখে ওদের সামাজিক আচারে বিয়েটা হবে এই দিল্লীতেই। তারপর গৌরী স্থায়ীভাবে চলে যাবে রথীনের সঙ্গে কলকাতায়। রথীনের ইচ্ছে গৌরী একবার

আগেই ঘুরে আসুক কলকাতাটা। কিন্তু ওর মায়ের ইচ্ছে তা নয়। মেয়ে তো স্বামীর ঘর করতে যাবেই। বিয়ের আগে যাওয়াটা তাঁর পছন্দ নয়। অবশ্য গৌরী জেদ ধরলে মা আর আপত্তি করবেন না।

রথীনের গাম্ভীর্য যে বিচ্ছেদের কারণে এটাই বুঝেছে গৌরী। তাই জিজ্ঞেস করেনি এতদিন। আজও ওকে বিমর্ষ আর গম্ভীর দেখে মনে মনে স্থির করে, রথীন জোর করলে একটা সপ্তা অন্তত কলকাতায় ঘুরে আসবে ওর সঙ্গে। দরকার হলে মাকেও নিয়ে যাবে। এমন ইচ্ছার আভাস মাকে দিয়েছে গৌরী।

কি ভাবছ রথীন ? কদিন খুব গম্ভীর হয়ে আছ।

রথীন গলায় আরো গাম্ভীর্য এনে বলে, কদিন তোমায় বলব বলব ভেবেও বলিনি। রাকেশের সঙ্গে তোমার আর মেশা উচিত নয়।

রথীনের কথায় গৌরী অবাক। রাকেশ ওদের বন্ধু। রথীন ওকে যথেষ্ট ভালবাসে। এমন কি ঘটল যাতে ওকে রাকেশের সঙ্গে মিশতে মানা করছে।

গৌরী জিজ্ঞেস করল, কেন বলত ? তোমার সঙ্গে কিছু হয়েছে ওর ?

না।

তবে।

ওর সঙ্গে তুমি মেশ এটা আমার পছন্দ নয়।

গৌরী ক্ষুন্ন হল। প্রচণ্ড স্বাধীনতাপ্রিয় জেদী মেয়ে গৌরী। কারো সঙ্গে মেশার ব্যাপারে নিজের স্বাধীনতাকে অধিকার বলে মনে করে। কারো পছন্দ অপছন্দের ধার ধারে না ও। হাসি মুখে ওর গাম্ভীর্য নেমে এলো।

তোমার অপছন্দের কারণটা বলবে কি ?

কারণ তুমি জান।

বুঝতে পারছি না। স্পষ্ট করে বল। রাকেশের সঙ্গে আমার কিছুই হয়নি। তবে ওর সঙ্গে মিশব না কেন।

সেদিন সুইমিং পুলের ব্যাপারটা আমার বিশ্রী লেগেছে। ওকে ওরকম স্বভাবের বলে জানতাম না। আমার খুব খারাপ লেগেছে।

কোনটা খারাপ লেগেছে, বলবে ?

রথীন মুখচোখ রাঙা করে বলল, রেসকিউয়ের নামে তোমার সঙ্গে যা করেছে সেটা অসভ্যতা। বুকের ওপর কাউকে জড়িয়ে নিয়ে জল থেকে রেসকিউ করা যায় না।

গৌরী অবাক হল রথীনের কথায়। যদিও রাকেশের সেদিনের ব্যবহারটা অস্বাভাবিক লেগেছিল গৌরীর। আগেও রেসকিউ প্র্যাকটিশ করেছে। কিন্তু অমনভাবে ওকে নিজের বুকে চেপে ধরেনি কখনো। অস্বস্তি লাগলেও আপত্তি করেনি গৌরী। কারণ ব্যাপারটায় কোনো গুরুত্ব দিতে চায়নি। যে ব্যাপারে ও গুরুত্ব দেয়নি সেটাই রথীনের চোখে পড়েছে। এটা কি ঈর্ষা। নাকি অন্য কিছু।

গৌরী চেষ্টা করে হাসল। হালকা করে বলল, ওই সামান্য ব্যাপারে তুমি চিন্তা করছ ?

রথীন গৌরীকে হাসতে দেখে আরো চটে গেল। বলল, তোমাদের কাছে যা সামান্য ব্যাপার আমার কাছে তা অসভ্যতা। আমি ওসব ঘৃণা করি।

দেখ, তুমি অহেতুক রাগ করছ। রাকেশ আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল ঠিক। কিন্তু তাতে কি আমি ক্ষয়ে গেছি !

সেটা তুমিই জান। তবে ওভাবে মেলামেশা মেয়েদের পক্ষে ভাল নয়, শোভন নয়।

গৌরী কি জবাব দেবে ? জবাব দিতে গেলে ঝগড়া বাড়বে। সুতরাং চুপ করে যমুনার কালো জলধারার দিকে তাকিয়ে রইল।

রথীন আবার বলল, তোমার সেদিনের পোষাক খুবই খারাপ হয়েছিল। ক্যালেণ্ডারে যা ভাল লাগে তা বাস্তবে ভাল লাগে না। সবাই হ্যাংলার মতো তোমার অর্দ্ধনগ্ন দেহটার দিকে বিশ্রী ভাবে তাকিয়ে ছিল। ও পোষাক তুমি পর এটাও আমার পছন্দ নয়।

গৌরীর শিক্ষায় স্বাধীনতায় রথীনের কথাগুলো লাগল। কঠিন হয়ে বলে ফেলল, ওটা স্নানের পোষাক। সাঁতার কাটতে গেলে শাড়ি পরে জলে নামা যায় না। আসলে তুমি আমায় সন্দেহ করছ। রাকেশকে তুমি অযথা হিংসে করছ।

তোমার ব্যবহারে করতে বাধ্য হচ্ছি।

আমার ব্যবহারে! কি এমন খারাপ ব্যবহার আমি করেছি বলো। তুমি আমাকে সন্দেহ কর! ছিঃ ছিঃ। আমাকে তুমি বিশ্বাস কর না! এই তুমি আমায় চিনলে। আমি ভাবতে পারছি না।

কথাটা শেষ করে গৌরী ছিটকে উঠে গেল। তারপর উদভ্রান্তের মতো বড় রাস্তার দিকে চলল। মনের গভীরে প্রচণ্ড এক ঘৃণা রথীনের ওপর। ঘৃণার সঙ্গে দুঃখ। রথীন ওকে বিশ্বাস করে না এটা ভাবতে কষ্ট হচ্ছে গৌরীর।...

বিচ্ছেদের সেই সূচনা।

তারপর রথীন এসেছে গৌরীর কাছে। নিজের ভুল স্বীকার করেছে। গৌরী কিন্তু সহজ হতে পারেনি। ফলে রথীন ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। পরের মাসে চাকরির খবর আসে কলকাতা থেকে। রথীন সে খবর নিয়ে ছুটে আসে গৌরীর কাছে। গৌরীকে নিয়ে কলকাতা যেতে চায়। গৌরী জবাব দেয়নি কোনো। ফলে বিচ্ছেদের ফাঁক বেড়ে যায়।

রথীনকে একদিন কলকাতায় চলে যেতে হয়েছে। মাতাজী দেখেছেন সব। মেয়েকে জিজ্ঞেসও করেছেন কারণ। গৌরী এড়িয়ে গেছে। বিচ্ছেদটা জেনেছেন তিনি কিন্তু কারণ জানতে পারেন নি।

এ কদিনে গৌরীর ঘনিষ্ট হয়ে বুঝেছি, ওদের সাময়িক বিচ্ছেদের কারণ অনুরাগ আর অভিমান। নিজে না বুঝলে বোঝানো যায় না। অথচ এ অবস্থা বেশি দিন চললে বিচ্ছেদ পাকা হয়ে যাবে। বিশেষ করে রথীন যখন গৌরীর কাছাকাছি নেই। ওর এই মনের অবস্থায় যে রথীনের নকল করতে পারবে সে গৌরীর হৃদয় দখল করে নিতে

পারবে। মেয়েটি জেদী একরোখা আর অভিমানিনী হলেও ওর মধ্যে সমর্পণের আকুতি আছে। পুরুষ মানুষ ওর ভয়ের কারণ নয়। পুরুষ মানুষ ওর কাছে শ্রদ্ধার ভালবাসার পাত্র।

মনে মনে সংকল্প করলাম, এ খেলা আর নয়। ওকে যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে অভীষ্টের দিকে ঠেলে দিতে পারি সেটাই হবে প্রকৃত বন্ধুর কাজ। যত কষ্টই হক আমাকে তা করতেই হবে। হিমালয়ের পথে এমন অনেক মেয়ের হৃদয়ের দ্বারে পৌঁছেছি যাদের সঙ্গে পরে আর যোগাযোগ হয়নি। গৌরীর হৃদয়ের গোপনতম অন্তঃপুরে প্রবেশ করে ওকে ভালবেসে ফেলেছি। জানি না ও আমাকে কতটা ভালবেসেছে। যাকে ভালবাসি তার জন্য সবচেয়ে প্রিয় বস্তু ত্যাগটাই তো সত্যিকার ভালবাসা। ভালবাসার দাম আমাকেই দিতে হবে।

সন্ধ্যার কিছু আগে গৌরীকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে বদরীনারায়ণ মন্দিরের নিচে ব্রহ্মকুণ্ডের কাছে বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ির ওপর বসেছি। দিনে অন্তত একবার আমরা এখানে এসে বসি। জায়গাটা খুব ভাল লেগেছে গৌরীর।

সন্ধ্যার দিকে জায়গাটা নির্জন থাকে। কদাচিৎ এক আধ জন সাধু এ ঘাটে জল নিতে আসেন। তাতে একান্তে গল্প করার কোনো অসুবিধে হয় না। এই ঘাটের কিনারে বসে গৌরী ওর অনেক কথা বলেছে।

গৌরীর একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে বললাম, এ যাত্রার স্মৃতি কত মধুর কত সুন্দর। আমার ভ্রমণ স্বার্থক।

গৌরী বলল, আমারও।

ভাল লেগেছে তোমার, গৌরী ?

খুব ভাল লেগেছে। এমন অভিজ্ঞতা যে এ-পথে হবে তা একবারও ভাবিনি।

কোন অভিজ্ঞতার কথা বলছ ?

এই হিমালয়ের নির্জনে ঘোরা বসা থাকা সবই আমার নতুন অভিজ্ঞতা। প্রথমটা ভেবেছিলাম বুঝি খুব বোর লাগবে। তারপর দেখলাম শহরের থেকেও ভাল লাগল। প্রকৃতিকে এমনভাবে দেখিনি কখনো। গৌরী আমার হাত নিজের হাতের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে গভীর আবেগে বলল, তুমি ছিলে তাই এত ভাল লাগল।

আমার জন্যে নয় গৌরী। বল, হিমালয়-প্রকৃতির জন্য লেগেছে। এখানে আমি অথবা রথীন যেই থাকুক না কেন, তোমার ভাল লাগত।

গৌরী বলল, মাঝে মাঝে তোমাকে আমার রথীন বলে মনে হয়েছে। ওর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ট হয়ে মিশেছিলাম তো। অবশ্য রথীন থাকলে এত আনন্দ করতে পারতাম না।

কেন?

ভীষণ খুঁত খুঁতে। অত খুঁত খুঁতে আর সন্দেহ বাতিক মানুষ নিয়ে হিমালয়ে ঘোরায় স্বস্তি নেই।

রাকেশের ব্যাপারে ওর অভিমান তুমি এখনো ভুলতে পারনি গৌরী।

ভোলা সম্ভব নয়। পারস্পরিক বিশ্বাস ছাড়া এ জগতে চলা যায়, বল?

তা যায় না ঠিক। কিন্তু রথীনের দোষ আমি দিতে পারছি না। নিজের প্রেয়সীর জন্য যে পুরুষের ঈর্ষা নেই সেখানে কিন্তু প্রেম একটা জোলো ব্যাপার। রথীন তোমায় প্রচণ্ড ভালবাসে বলে ওর ঈর্ষা। অন্য পুরুষ তোমার আঘ্রাণ নেবে এটা সহ্য করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। আমার মনে হয় পুরুষের ভালবাসার মধ্যে এ ধরনের একটু ব্যাপার মেয়েরা গৌরব বলেই মনে করে।

গৌরী নরম সুরে বলল, তোমার কথা ঠিক। কিন্তু ও যে আমায় সন্দেহ করে। এটা আমি সহ্য করি কেমন করে?

গৌরী ওটা সন্দেহ নয়। ওর একান্ত করে চাওয়াটা তো অপরাধ

নয়। তুমি যেটাকে সন্দেহ মনে করছ তা আসলে তীব্র অনুরাগ আর রাকেশের প্রতি ঈর্ষা। তুমি যদি রথীনকে সত্যি ভালবেসে থাক, তাহলে ওর অনুরাগের মর্যাদা দেবে।

তাই তো দেবার জন্য নিজেকে তৈরি করেছিলাম। কিন্তু···

এতে কিন্তু নেই। রথীন অনুতপ্ত হয়ে তোমার কাছে ফিরে এসেছিল। তাকে তুমি ফিরিয়ে দিয়েছ। সত্যি যদি ও তোমায় সন্দেহ করত তাহলে ক্ষমা চাইতে আসতে পারত না। ওকে তুমি ক্ষমা করো গৌরী। ওকে গ্রহণ করলে তুমি সুখী হবে।

গৌরী হঠাৎ আমার কোলে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল।

আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। গৌরী হু-হু করে কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে কাঁপছে। উত্তুরে বাতাসে হিমের শিহরণ দিচ্ছে। ঠাণ্ডায় বসতে কষ্ট হলেও এ মুহূর্তের এই ভেঙ্গে পড়া মেয়েটিকে তার কান্নায় বাধা দিতে চাইলাম না। অনেক দিনের জমাট ব্যথা ওর গলে গলে পড়ছে। হালকা হোক, গৌরী চোখের জল ফেলে।

তীর্থ শেষে ফিরে এসেছি ঋষিকেশ।

তীর্থের সুফল লাভ করে মাতাজী খুশিতে ভরপুর। খুশি হয়েছেন গৌরীর কথা শুনে। গৌরী রাজি হয়েছে রথীনকে চিঠি দিতে। আমাদের সব কথাই খুলে বলেছি মাতাজীকে।

ধর্মশালার একই ঘরে উঠেছি। আগামীকাল কলকাতার গাড়ি ধরব। গৌরীরা আজ রাতের মুসৌরী-দিল্লী এক্সপ্রেস ধরবে।

গতকাল মাতাজী বলেছিলেন, গৌরীকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও কলকাতায়। রথীনের বাড়িতে কিম্বা তোমাদের বাড়িতে যেখানে ওর ভাল লাগে সেখানেই থাকুক কদিন। গৌরী শুনে আপত্তি করেছে। বলেছে, এখন নয় মা, পরে যাব। আমি হ্যাঁ-না কিছুই বলিনি। শেষে গৌরীর মা আমায় অনুরোধ করেছেন দিল্লীতে আসার জন্য। পরে এক সময় দিল্লীতে যাব কথা দিয়েছি।

চলার পথে পরিচয় হয় এমনভাবেই। আত্মীয়তা গাঢ় হয়। যারা সেই স্মৃতিকে ধরে রাখে সেখানে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমি আবার সেই দলের লোক নই। হিমালয়ের পথে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা কিন্তু শহরে থাকে না। অন্তত আমার তাই মনে হয়। আমি সম্পর্ক রাখতে পারিনি বলেই আমার হয়ত এ ধারণা হয়েছে। গৌরীর মাকে কথা দিয়েছি কিন্তু রাখতে পারব কি-না জানি না। তবে যে স্মৃতি মনের পটে এঁকে নিয়ে যাচ্ছি তা চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে।

সারাদিন মালপত্র গোছগাছ বাধা ছাঁদা করেছি। গৌরী নীরবে আমাকে সাহায্য করেছে। কোনো কথা বলিনি কেউ। দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়েছি বার বার, কিন্তু কথা বলতে পারিনি আমরা। হিমালয়ের পথের মধুর স্মৃতিগুলো বার বার মনে পড়েছে।

সন্ধ্যার কিছু পরে টাঙায় মালপত্র তুলে মাতাজী আর গৌরীকে নিয়ে ঋষিকেশ রেল স্টেশনে এলাম। ট্রেন দাঁড়িয়েছিল। এটা ঋষিকেশ-হরিদ্বার সাটেল্ ট্রেন, দিনে দু' বার যায় আসে। সাটেল্ ট্রেনের দিল্লী শ্লিপিং কোচে গৌরীদের বার্থ রিজার্ভ হয়েছে। কোচটা হরিদ্বারে দিল্লী এক্সপ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে।

ঢং-ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজল। গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে।

গাড়ি থেকে নেমে এলাম প্ল্যাটফর্মে। মাতাজী জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছিলেন। প্ল্যাটফর্মে নামতেই বললেন, বেটা, আশা করে থাকব। দিল্লী এসো কিন্তু।

আসব মাতাজী।

ঠিক তো ?

ঠিক।

ট্রেনের গার্ডসাহেব সবুজ আলো নেড়ে গাড়ি ছাড়ার সংকেত দিলেন। ড্রাইভার হুইসিল বাজাল। গৌরী জানলার বাইরে মুখ বার করল।

গৌরীর সজল দুটি চোখ। টল টল করছে জলে।

আমি হাত বাড়িয়ে ওর হাত ধরলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কিছু বলবে গৌরী ?

গৌরীর ঠোঁট দুটো কাঁপল থর থর করে। এত শক্ত মেয়েটা কেমন যেন হয়ে গেছে। কাঁপা গলায় বলল, তোমার কাছে আমি অনেক পেলাম কিন্তু কিছু দিতে পারলাম না। আমায় ক্ষমা করো।

ক্ষমা নয় গৌরী, বরং বল মনে রাখব। চলার পথে যা পাওয়া যায় সেটাই তো লাভ।

গৌরী জবাব দিতে পারল না। কিছু বলতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

ট্রেন ছাড়ল। যাত্রীরা গঙ্গা মাইকী জয়ধ্বনি দিল।

ট্রেন এগিয়ে চলেছে। আমিও এগিয়ে চলেছি। একসময় আমার গতির চেয়ে ট্রেনের গতি বাড়ল। আমি থামলাম। চেয়ে রইলাম গৌরীর দিকে। গৌরীও চেয়ে আছে। ওর চোখ বেয়ে অঝোরে জল ঝরে পড়ছে তখনো।

—